তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কেন না আমরা দেখিতে পাই কৃত্তিবাস ও কাশীদাস উভয়েই কথকগণের নিকট হইতেই মর্ম্মজ্ঞাত হইয়া নিজ নিজ কাব্য রচনা করিয়াছেন; কৃত্তিবাস যে কথকতা শুনিয়া রামায়ণ রচনা করেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থে একাধিক স্থলে উল্লেখ আছে; সুতরাং কৃত্তিবাসের সময়ের অনেক পূর্ব্বেই যে কথকতার উৎপত্তি তাহাতে আর সন্দেহ কি? কৃত্তিবাস খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর লোক বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছেন, তাহা হইলে কথকতা যে সেই সময়ে কিম্বা তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কথকগণ অধিকাংশ গদ্য ও মধ্যে মধ্যে দুই চারিটি গীত গাহিয়া থাকেন; পূর্ব্বে যে এরূপ নিয়ম ছিল না তাহা কে বলিতে পারে; পূর্ব্বকালে এখনকার মত ঠিক না থাকিলেও যে তাঁহারা গদ্য পদ্যময় গীতি ব্যবহার করিতেন, তাহা "কথকতা" শব্দের ব্যুৎপত্তি ধরিলেই জানা যায়। তাহা হইলে আমরা যে সতত অনুযোগ করিয়া থাকি যে, ইংরাজ শাসনের পূর্ব্বে এদেশে কোন গদ্য গ্রন্থকার ছিলেন না তাহা সত্য নহে; ব্রিটিস রাজত্বের পূর্ব্বে অপর কোন গদ্য গ্রন্থকার না থাকিলেও যে, কথকগণ বর্ত্তমান ছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই? সুতরাং তখন গদ্য রচনাও সমাজে লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইয়াছিল; তবে কথকগণ গদ্য রচনাও সময়ে সময়ে তান-লয় সুর-সংযোগে পদ্যের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা গদ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহা হইলেই গদ্য রীতি যে আধুনিক কালের তাহা নহে; তবে যে কেন আমরা পূর্ব্বকালের কোন বঙ্গীয় গদ্য লেখক দেখিতে পাই না তাহার যথেষ্ট কারণ আছে। অতি পুরাকাল হইতে

ভারতবর্ষে পদ্য রীতিরই অধিক প্রচলন আছে; কি ইতিহাস কি ভূগোল, কি দর্শন—কি বিজ্ঞান সমুদায়ই লিখিবার সময় আর্য্য-ঋষিগণ পদ্য প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন; তাহার কারণ পদ্যে যত শীঘ্র মন আকৃষ্ট হয় ও লোকের মনে উত্তম রূপে অঙ্কিত হয়, গদ্যে তত নহে। সেই জন্য ঋষিগণ গদ্য অপেক্ষা পদ্যেরই অধিক পোষকতা করিয়াছেন—সেই জন্যই ভূরি ভূরি সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে দুই চারি খানি [illegible] মাত্র গদ্যে লিখিত। আমাদের বাঙ্গালা ভাষা অতি কোমল ভাষা; গীতি কাব্যই ইহার প্রাণ; রাধাকৃষ্ণের চরণ হইতেই ইহার উৎপত্তি; রাধাকৃষ্ণের প্রেম বর্ণনাই ইহার সর্ব্বস্ব; সেই প্রেম ভাব সকলের মনে অঙ্কিত ও উজ্জীবিত রাখিবার জন্য, কেন না পদ্য প্রথা অবলম্বিত হইবে? তত্রাপি আমরা দেখিতে পাই বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিগণ অধিকাংশ গীতি রচনা করিলেও, দুই চারিটি গদ্য লিখিতেও বিরত হন নাই; যদিও তাঁহাদের রচিত গদ্য কাব্য এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য অথবা একেবারেই অপ্রাপ্য, তথাপি তাঁহারা যে গদ্য রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে যে আমরা তাঁহাদের রচিত কোন গদ্য রচনা পাই না, তাহার কারণ বঙ্গীয় সাধারণ লোকের অনবধানতা, ঔদাসীন্য ও আস্থা শূন্যতা। কেন না, তাঁহাদের যে সকল রচনা মধুর বলিয়া বোধ হইয়াছে ও মনের সহিত বেশ মিলিয়াছে সাধারণ লোকে তাহাই নকল করিয়াছিলেন, সুতরাং বিদ্যাপতি প্রভৃতির রচিত গদ্য রচনা লোকের ঔদাসীন্যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আবার চিরাভ্যাস বশতঃ লোকের পদ্যের প্রতি যেরূপ আস্থা ও ভক্তি গদ্যের প্রতি তত নহে, কাজেই গদ্য লেখা গুলি অবহেলিত হইয়া ক্রমশঃ লোপ

পাইয়াছে। আমরা এক্ষণে আর কোন উপায়েই বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাস রচিত গদ্য লেখা হস্তগত করিতে পারি না, কিন্তু গোবিন্দদাসসমাজে তাঁহাদের গদ্য রচনাও প্রচলিত ছিল; গোবিন্দদাস, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস রচিত বহুল গদ্য রচনা পাঠ করিয়াছিলেন; সেই জন্যই তিনি বিদ্যাপতি প্রভৃতির বন্দনাস্থলে এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন; বিদ্যাপতির গদ্য রচনা সে সময়ে প্রচলিত না থাকিলে কখনই তিনি তাহা উল্লেখ করিতেন না। আমরা এই স্থলে গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিগণ যেরূপে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গদ্য রচনার উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সেই স্থান উদ্ধৃত করিলাম।

গোবিন্দদাস বিদ্যাপতি বন্দনাস্থলে লিখিয়াছেন;—

যত যত রস-পদ কর লহি বন্ধে।
কোটি হি কোটি, শ্রবণ পর পাইয়ে,
শুনইতে আনন্দে লাগই ধন্ধে।
সোরস শুনি নাগর বর নারী।
কিয়ে কিয়ে করেচিত, চমকয়ে ঐছন,
রসময় চম্প্ু বিথারি॥ ইত্যাদি।

চম্প্ শব্দের অর্থ গদ্য পদ্যময় কাব্য; তাহা হইলে বেশ প্রতীয়মান হইতেছে যে, গোবিন্দদাস বিদ্যাপতি প্রণীত গদ্য পদ্যময় কাব্য পাঠ করিয়াছিলেন; আরও দেখিতে পাই, বৈষ্ণব কবি বৈষ্ণবদাস কবি বন্দনাস্থলে এই কথা বেশ বিষদ করিয়া লিখিয়াছেন; আমরা এই স্থলে তাহা গ্রহণ করিলাম,—

জয় জয়দেব কবি নৃপতি শিরোমণি,
বিদ্যাপতি রসধাম।

জয় জয় চণ্ডীদাস, রস শেখর,
অখিল ভুবনে অনুপাম ॥
যাকর রচিত, মধুর রস নিরমল,
গদ্য পদ্যময় গীত।
প্রভু মোর গৌর চন্দ্র, আস্বাদিল
রায় স্বরূপ সহিত। ইত্যাদি।

ইহাতেই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস পদ্যের ন্যায় অনেক গদ্যও রচনা করিয়াছিলেন; তবে সে সকল লোকের প্রবৃত্তি অনুসারে ক্রমশঃ লোপ পাইয়াছে। যাহা হউক, যখন বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গদ্য রচনার অস্তিত্ব ছিল বলিয়া জানা যাইতেছে, তখন ভাষার প্রথম হইতেই যে গদ্য প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা নিশ্চয়; বিদ্যাপতির সময়েই গদ্য ও পদ্য রীতি উভয়ই প্রচলিত হইয়াছিল এবং বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস যেমন বঙ্গভাষার আদি পদ্য লেখক তেমনই তাঁহারা ভাষার প্রথম গদ্য লেখক। আমরা বহুল অনুসন্ধানে তাঁহাদের রচিত গ্রন্থ হস্তগত করিতে না পারিলেও চৈতন্যচন্দ্র সম-সাময়িক শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী বিরচিত গদ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছি। রূপ গোস্বামী "কারিকা" নামে যে একখানি গদ্য গ্রন্থ রচনা করেন, আমরা তাহা পাইয়াছি ও যত্নে রক্ষা করিয়াছি; তদানীন্তন বাঙ্গালা গদ্যের আকার কি প্রকার ছিল প্রদর্শন করিবার জন্য, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম; পুস্তক খানির প্রারম্ভ বাক্য এই প্রকার; "শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদ জয়। অথ বস্তু নির্ণয়। প্রথম শ্রীকৃষ্ণ গুণ নির্ণয়। শব্দ গুণ, গন্ধ গুণ, রূপ গুণ, রস গুণ, স্পর্শ গুণ এই পাঁচ গুণ। এই পঞ্চ গুণ, শ্রীমতি রাধিকাতেও বসে। শব্দগুণ কর্ণে,

গন্ধ গুণ নাসাতে, রূপ গুণ নেত্রে, রস গুণ অধরে, স্পর্শ গুণ অঙ্গে। এই পঞ্চ গুণে পূর্ব্ব রাগের উদয়—পূর্ব্ব রাগের মূল দুই; হটাৎ শ্রবণ, অকস্মাৎ শ্রবণ। ইত্যাদি।” সুতরাং যখন রূপ গোস্বামী প্রণীত গ্রন্থ আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তখন যে বিদ্যাপতির গদ্য রচনা ছিল না ও তাহা বহুল অনুসন্ধানে সংগৃহীত হইবে না, এ কথা আমরা বলিতে পারি না। তবে গদ্য রচনা প্রচলিত থাকিলেও তাহার বিশেষ প্রসর ছিল না এ কথা স্বীকার করিতে হইবে; এবং এই জন্যই তাহার পরবর্ত্তী সময়ের কোন গদ্য গ্রন্থই আমরা পাই না। এই সময়ে এই প্রথা কিঞ্চিৎ অবহেলিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু কবিকঙ্কণের সময়ের অনেক পূর্ব্বেই যে ইহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সে পক্ষে কিছুমাত্র সংশয় নাই; কেন না কৃত্তিবাস পণ্ডিত কথায় কথায় তদীয় রামায়ণে কথকগণের উল্লেখ করিয়াছেন। মধ্য সময়ে কথকগণই কেবল গদ্য রীতির উপাসক ছিলেন; তাঁহাদের সময় হইতেই গদ্য রচনার আলোচনা আর বন্ধ হয় নাই; তবে ব্রিটিষ রাজত্বের পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত ইহাতে বিশেষ কিছুই বলাধান হয় নাই, একথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু গদ্য রচনার উৎপত্তি ব্রিটিষ রাজত্বের অনেক পূর্ব্বেই হইয়াছে; যাহা হউক আমরা এই স্থানে গদ্য রচনা ও কথকবৃন্দকে পরিত্যাগ করিয়া নূতন কালে উপনীত হইতেছি।

আমরা এইবার কবিকঙ্কণ সমাজে উপস্থিত হইলাম; কবিকঙ্কণ কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা এক প্রকার দেখান হইয়াছে; যে সময়ে প্রবল প্রতাপান্বিত আকবর সাহ দিল্লীর সিংহাসনে আসীন ছিলেন কবিকঙ্কণ সেই সময়ে বর্ত্ত-

মান ছিলেন; তিনি আকবর সাহের প্রধান কর্ম্মচারী মহারাজ মানসিংহের কর্ত্তৃত্বকালে প্রিয়তম জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; কবিকঙ্কণের সময়ের পূর্ব্বেই বঙ্গদেশ স্বাধীন পাঠান রাজগণের অধীন ছিল; তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বাধীনে বঙ্গীয় প্রজাগণ কিরূপে নিগৃহীত হইত তাহাও পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে; তাঁহাদের শাসন কাল হইতেই সমাজে ঘোর নিশা আরম্ভ হইয়াছে—কবিকঙ্কণের সময়ে সমাজের অস্থি-মজ্জায় দুঃখের প্রবাহ প্রবেশ করিয়াছে—তখন সুখ আপনার সমুদায় সম্পত্তি লইয়া প্রজাগণের নিকট হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়াছে; প্রজাগণ আপনা লইয়াই ব্যস্ত, দুঃখ-শোকে কাতর, মর্ম্ম-পীড়ায় নিপীড়িত; এমন মর্ম্ম-পীড়ায় কাতর হিন্দুসন্তানের আর উপায় কি? হিন্দুসন্তান এমন দুঃসময়ে আর কাহার শরণ লইবে? ক্ষমতা নাই—সাহস নাই; কিরূপে বঙ্গবাসী এই দুস্তর দুঃখ সাগর হইতে পার হইতে পারেন; এমন বিপৎকালে বঙ্গবাসীর চির-সেবিত দেবতা ভিন্ন আর কে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে পারেন? সকল দেবতা নহেন; যিনি এক সময়ে দুর্দ্দান্ত অসুর নিচয় বিনাশ করিয়া পৃথিবী পিশাচ শূন্য করিয়াছিলেন, তিনি ভিন্ন হিন্দু সন্তানের এ দুঃসময়ে আর উপায়ান্তর কি? তিনি যদি এই হিন্দুরক্ত-লোলুপ অসুর প্রকৃতিক যবনগণকে বিনাশ করিয়া সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীগণকে রক্ষা না করেন, তবে আর কে তাঁহাদিগকে অভয় প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন? তাই সেই অসুর-ঘাতিনী—মহিষ-মর্দ্দিনীর অর্চ্চনা প্রয়োজন; কবিকঙ্কণ যবন ভয়ে সাতপুরুষের প্রিয় বাস্তভিটাটি বিনা বাক্যব্যয়ে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেও যবন ধ্বংশ কামনা তাঁহার পবিত্র

মানসক্ষেত্র হইতে দিনেকের জন্য অন্তর্হিত হয় নাই। অন্তরের এই নিভৃত কথা প্রকাশ করিবার সামর্থ্য নাই—কি জানি তাহা করিলে যদি কোন বিপদ ঘটে; কিন্তু এই চিন্তা তাঁহার যপ স্বরূপ ছিল; এই জন্যই কবিকঙ্কণ পলায়ন করিতেছেন, পথিমধ্যে পথশ্রান্ত ও চিন্তাক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন; এমন সময় তাঁহার প্রতি চণ্ডীর আদেশ হইল; চণ্ডী তাঁহাকে অভয় দিলেন এবং তাঁহার মঙ্গল গান—তাঁহার মাহাত্ম্য বর্ণন বঙ্গের প্রতি লোকের হৃদয়ে উজ্জীবিত করিতে পারিলে তাঁহার মনোভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে এই উপদেশ দিলেন; কবিকঙ্কণের বাসনাপাবকশিখা দ্বিগুণতর উদ্দীপিত হইল—তাঁহার হৃদয় দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত হইল; তিনি সেই মুহূর্ত্ত হইতেই দেবী মাহাত্ম্যলীলা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; তাঁহার প্রশস্থ কল্পনারাজ্য আরও প্রসারিত হইল; তিনি নূতন প্রকারে নূতন গান ধরিলেন।

কবিকঙ্কণ আপনার মনোভিলাষ পূর্ণ করিবার উদ্দেশেই কালকেতুর সৃষ্টি করিয়াছেন; কালকেতু অতি সামান্য লোক ও ব্যাধ বংশে তাঁহার জন্ম; কিন্তু দেবীর সামান্য মাত্র কৃপা-কণা লাভেই তিনি অসামান্য কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইলেন; আবার তাঁহার মত নিরতিশয় দুঃখে নিপতিত হইলে, চণ্ডীর সামান্য অনুগ্রহ দৃষ্টিতে সমুদায় আপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে, ইহা লোককে উপদেশ দিবার জন্যই শ্রীমন্তের অবতারণ; কবিকঙ্কণ, কালকেতু ও শ্রীমন্তের দ্বারা আপনার মনের অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং এই দুই জনের আদর্শ যাহাতে বঙ্গবাসী গ্রহণ করিয়া সকল আপদ হইতে আপনাদিগকে উদ্ধার সাধন করিতে পারেন ও পরিশেষে

সুখের বিমল স্বাদ গ্রহণ করিতে পারেন সেই জন্য সচেষ্টিত হইয়াছেন। সকল লোকেই যাহাতে চণ্ডীর আরাধনা করেন—তাঁহার আরাধনায় সকলে বলীয়ান হইয়া উঠেন এইটিই তাঁহার অন্তরের রম্য অভিলাষ। এই জন্যই তাঁহাকে চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য নূতন পথ অবলম্বন করিতে হইয়াছিল—তিনি এই জন্যই কল্পিত উপাখ্যান অবলম্বন করিয়াছিলেন। কালকেতু ও শ্রীমন্তের আখ্যায়িকা তাঁহার স্বকপোল কল্পিত; তাঁহার পূর্ব্বে অন্য কোন কবিই কোন প্রকার আখ্যায়িকা রচনা করেন নাই; যদিও ক্ষমানন্দ ও কেতকানন্দ দাস দুই জন একত্রে "মনসার ভাষাণ" নামক উপাখ্যান রচনা করিয়াছিলেন, তত্রাপি তাহা তাঁহাদের স্বকপোল-কল্পিত বলিয়া বোধ হয় না; বঙ্গদেশে সর্পভীতি পূর্ব্বকাল হইতেই প্রবল—সুতরাং সময়ে সময়ে মনসাদেবীর পূজার্চ্চনা হইত ও বেহুলা নখীন্দরের আখ্যায়িকা পূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত ছিল; সেই গল্প অবলম্বন করিয়াই ক্ষমানন্দ আপনার "মনসার ভাষাণ" রচনা করেন। যাহা হউক কবিকঙ্কণই স্বকপোল-কল্পিত আখ্যায়িকার জন্মদাতা; এক্ষণে যে বঙ্গদেশ উপন্যাসমালায় আচ্ছন্ন হইয়াছে—বঙ্গভাষায় কবিকঙ্কণই সেই উপন্যাসের সৃষ্টিকর্ত্তা।

কবিকঙ্কণ বঙ্গভাষার প্রথম উপন্যাস লেখক; তাঁহার উপন্যাসে, চরিত্র চিত্রণে কোন দোষ স্পর্শ করে নাই; একের চরিত্রের ছায়া অপর চরিত্রে নাই; সকল চরিত্রই সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন ও সুন্দর রঙ্গে চিত্রিত—তাঁহার মত সুচিত্রকর সহজে পাওয়া যায় না। তিনিই বঙ্গভাষার প্রথম প্রধান মহাকবি; তাঁহার পূর্ব্বে যে সকল কাব্য রচিত হইয়াছিল তৎসমুদায়ই প্রায় গীতিকাব্য—সম্পূর্ণ নূতন মহাকাব্য আর ছিল না। তিনি

এই সময়ে বঙ্গভাষার কণ্ঠে যে মণিহার প্রদান করিলেন তাহার আর তুলনা নাই। কবিকঙ্কণ চিরজীবন দুঃখেই কাটাইয়া ছিলেন—সুতরাং তিনি যেমন দারিদ্র্য জীবন চিত্রিত করিতে পারিয়াছেন এমন আর কেহই নহেন, আবার সামান্য আহ্লাদের কথা নহে যে, পূর্ব্ব কবিগণের অশ্লীল আদিরস তাঁহার গ্রন্থকে স্পর্শও করিতে পারে নাই; কবিকঙ্কণ আদিরস বর্ণনা করিয়াছেন বটে কিন্তু তাহাতে অশ্লীলতার লেশ মাত্রও নাই; তিনি তাঁহার প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য—স্বদেশীয় লোককে বীরভাবে উদ্দীপিত করিবার জন্য, দেবী মাহাত্ম্য লিখিতেছেন সুতরাং তাহাতে অশ্লীলতা থাকিবে কেন? আবার তাঁহার রচনায় বিদেশীয় ভাব কিছুমাত্র প্রবেশ করে নাই—তাঁহার মত প্রতিভাশালী প্রকৃত বঙ্গীয় কবি বঙ্গদেশে আর দেখিতে পাই না; তিনি কি বাহ্য জগৎ বর্ণনায়—কি মানব স্বভাব পরিজ্ঞানে—কি করুণ রসের উদ্দীপনায় সকল বিষয়েই অদ্বিতীয়; তাঁহার সুকল্পনা শক্তির নিকট আর কেহই তিষ্ঠিতে পারেন না; তাঁহার কল্পনা বিচিত্রভাবভরা—তাঁহার প্রতিভা অতুলনীয়া; তিনি যাহা কিছু রচনা করিয়াছেন তাহা তাঁহারই স্বকপোল-কল্পিত। তিনি চণ্ডীকাব্যে যে সকল মনুষ্য চরিত্র আনিয়াছেন তাহা অতি সুন্দররূপে চিত্রিত করিয়াছেন, আবার মনুষ্য চরিত্র ব্যতীত দেব চরিত্র সকলও অতি বিকচ রূপে বিভাষিত করিয়াছেন; যাহা হউক সকল বিষয়েই তাঁহার তুলনা নাই; তবে তাঁহার ভাষা ভারতচন্দ্রের চাঁচাছোলা মসৃণ ভাষার ন্যায় সুমার্জ্জিত ও সুপরিস্কৃত নহে; তাহাতে আর তাঁহার দোষ দেওয়া যায় না—তিনি যে সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, বঙ্গভাষার আকার তখন সেই প্রকারই ছিল; কৃত্তিবাসের

রচনাতেও আমরা ঠিক সেইরূপই ভাষা দেখি; আমরা এক্ষণে যে মুদ্রিত কৃত্তিবাসের রামায়ণ দেখিতে পাই, তাহা তাঁহার নিজের ভাষা নহে; পণ্ডিতবর জয়নারায়ণ তর্কালঙ্কার কৃত্তিবাসের ভাষার এইরূপ বিকৃতি সাধন করিয়াছেন; তিনি কতিপয় খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারকগণের পরামর্শে কৃত্তিবাসের ভাষা সংশোধন করিয়া আধুনিক ভাষার মত করেন; যাহা হউক কবিকঙ্কণের ভাষা ষোড়শ শতাব্দীর বঙ্গীয় সমাজের ভাষা; তাহাতে ছন্দোবন্ধের তাদৃশ ঘটা নাই—ভাষার তত মনোহর ছটা নাই—তত্রাপি তাঁহার কাব্য বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশের প্রদীপ্ত ভাস্কর স্বরূপ—সাহিত্যভাণ্ডার মধ্যস্থ মহামূল্য রত্ন নিচয় মধ্যে কহিনূর; শুধু বঙ্গীয়ভাব পূর্ণ এমন মহামূল্য অলঙ্কার বঙ্গীয় সাহিত্য আর কখন অঙ্গে দেন নাই।

কবিকঙ্কণ যাহাতে স্বীয় রচনা সকলেরই চিত্তাকর্ষক হয় ও সকলেই যাহাতে উদ্দীপিত হন, এই জন্য তাহা চণ্ডীর আজ্ঞায় রচিত হইয়াছে বলিয়াছেন; তিনি গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণে লিখিয়াছেন—

করিয়া পরম দয়া, দিয়া চরণের ছায়া,
আজ্ঞাদিল রচিতে সঙ্গীত।

অন্য এক স্থলে,—

হাতে করি পত্র মসি, আপনি কলমে বসি,
নানা ছাঁদে লিখান কবিত্ব।

এরূপ দেবী বাক্যের দোহাই দিবার অন্য কোন কারণই দেখা যায় না কেবল তিনি যাহা লিখিতেছেন তাহা সকলেরই আলোচ্য হইবে ইহার জন্য। তাঁহার পূর্ব্বে অন্য কোন কবিই স্বীয় গ্রন্থে এইরূপে দেবতার আজ্ঞা খ্যাপন করেন নাই; কিন্তু বঙ্গীয় কোন কবি তাঁহার পূর্ব্বে এরূপ না

করিলেও, অন্যদেশীয় কোন কোন কবি এইরূপে আপনার প্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য, এবম্বিধ কথা ঘোষণা করিয়াছেন দেখা যায়। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর আজ্ঞায় গ্রন্থ রচনা করিতেছেন মনে হইলেই ইংরাজী প্রথম কবি সিডমনের (Caedmon) কথা মনে পড়ে। সিডমন এইরূপ লিখিয়াছেন, তিনি পূর্ব্বে কবি ছিলেন না কিম্বা কাব্যে তাঁহার আদর ছিল না; একদিন কোন স্থানে কতকগুলি ভদ্রলোক আমন্ত্রিত হইয়াছেন, সিডমনও তথায় উপস্থিত; সেই স্থলে সেই সময়ে সঙ্গীতের তরঙ্গ উঠিল; সিডমন তথা হইতে সরিয়া পড়িলেন ও আসিয়া মনোদুঃখে অন্য এক নির্জ্জন স্থানে ঘুমাইয়া পড়িলেন; এমন সময়ে কবিতাদেবী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিতা, তিনি বলিলেন সিডমন ঘুমাইয়া কেন? একটী কবিতা রচনা ও তাহা গান কর; সিডমন উত্তর করিলেন আমি গান জানি না কি করিয়া রচনা করিব; দেবী বলিলেন আমার কৃপায় তুমি উত্তম কবি হইবে; সিডমন নিদ্রাভঙ্গে উঠিলেন; সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তাঁহার মুখদিয়া অনর্গল কবিতা নিঃসৃত হইতে লাগিল; লোকে তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়া অবাক হইয়া পড়িল। সিডমন সেই দেবীর আজ্ঞাতেই ইংরাজী ভাষার মহাকাব্য রচনা করিলেন *। তিনি নিজে এক জন ধর্ম্ম যাজক ছিলেন; এবং তিনি পৃথিবীর সৃষ্টি প্রকরণাদি আপন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন; যাহাতে তাঁহার রচনা সকলেরই হৃদয়াকর্ষক ও অভ্রান্ত বলিয়া সকলের মনে ধারণা হয় তাহা করিবার জন্যই তিনি এইরূপ

* J. R. Green's short History of the English people. Ch. I Sec. 3. Page 26.

দেবী আজ্ঞার কথা খ্যাপন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কবিকঙ্কণও ঠিক সেই কারণ বশতঃই আপন গ্রন্থ দেবী আজ্ঞায় সংরচিত হইয়াছে বলিয়াছেন। চণ্ডীর পূজায় সকলে উদ্দীপ্ত হইয়া যাহাতে যবনগণকে দেশ হইতে দূরীভূত করিয়া দেয় এইটিই তাঁহার হৃদয়ের মূল মন্ত্র—ইহাই তাঁহার অন্তরের বাসনা; সেই অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্যই তিনি চণ্ডীকাব্য রচনা করিয়াছেন, সুতরাং তাহাতে দেবীর আজ্ঞার কথা না বলিবেন কেন? তাঁহার সময়ে যবন অত্যাচারে লোকে প্রপীড়িত—সমাজ দুঃখে পরিপূর্ণ; তখন আর লোকের দুঃখ হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই, দুর্গতি রাখিতে স্থান নাই; সুতরাং দুর্গতি নাশিনী দুর্গা ভিন্ন তখন লোকের আর উপায়ান্তর কি? সেই দুর্গাই যাহাতে সকলেরই তপ, যপ, ধ্যান, জ্ঞান হয় তাহার বিধান করাই বিহিত। বাঙ্গালী বিপদে পড়িলে দেবানুগ্রহের প্রার্থী; দেবতার অনুগ্রহে সেই বিপদ্‌জাল হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে চাহে; সুতরাং মুসলমানগণের অত্যাচার সময়ে হিন্দুমাত্রেই দেবানুগ্রহের প্রার্থী ছিলেন; সেই দেবানুগ্রহপ্রার্থী সমাজের ফল মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল। লোকে সকল দেবতারই অনুগ্রহ প্রার্থী ছিলেন; কিন্তু মুকুন্দরাম সমাজের এই দুঃসময়ে চণ্ডীই সকলের শরণ্য এই কথা প্রচার করিলেন। সকল লোককে তিনি উপযুক্ত দেবীর প্রতি আকর্ষণ করিলেন। সকলের মন চণ্ডীর দিকে আকৃষ্ট হইল; সকলেরই হৃদয় চণ্ডী মাহাত্ম্যে নাচিয়া উঠিল। সমাজে বলাধান হইবার সূত্রপাত হইল।

দুঃখের অবস্থায় যুগপৎ ভবিষ্যতের আশা ও অতীত স্মৃতি লোকের মনকে উদ্বেলিত করে। কেহ বেহ ভবিষ্যৎ সুখ

কামনায় মুগ্ধ হইয়া কোন রূপে কষ্টে সৃষ্টে জীবনাতিবাহিত করেন, আবার কেহ বা অতীত সুখ স্মরণ করিয়া পরিতৃপ্ত রহেন; কবিকঙ্কণ প্রথম দলের নেতা—কৃত্তিবাস দ্বিতীয় দলের চূড়া। দুই জনই এক দুঃখের সমাজে বর্ত্তমান ছিলেন; একজন ভবিষ্যৎ কামনায় মুগ্ধ—অপর জন অতীত সুখ স্মরণেই পরিতৃপ্ত; একজন, যে চণ্ডী মাহাত্ম্য বীজ বপন করিলেন তাহার বলে চণ্ডীর প্রসাদে ভবিষ্যতে কালকেতুর ন্যায় কোন লোক জন্ম গ্রহণ করিয়া, দেশে শান্তি স্থাপন করিতে পারে—লোকে শ্রীমন্তের ন্যায় নানা দুঃখে পতিত হইয়াও পরিশেষে ভগবতীর কৃপায় সকল প্রকার বিপদ হইতে উদ্ধার সাধন করিতে পারে—এই মনে করিয়া প্রশান্তচিত্ত; ও অন্যজন যে অতীত রামলীলা গান রূপ বীজ বপন করিলেন তাহার বলে লোকে সকল প্রকার দুঃখেই রামচন্দ্রের ন্যায় প্রশান্ত থাকিতে পারে,—সকল বিপদকেই উপেক্ষা করিয়া রামচন্দ্রের ন্যায় অটল থাকিতে পারে এই ভাবিয়াই হৃষ্ট চিত্ত। একজন মর্ম্মান্তিক পীড়ায় অত্যন্ত কাতর—অন্তর্দ্দাহে ভস্মীভূত—তাই প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি তাঁহার সাতিশয় প্রবল—তাই যবন বধ সাধন তাঁহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে গ্রথিত এবং সেই জন্যই তিনি অসুরঘাতিনী সুরেশ্বরীর প্রিয় সেবক; অপর জনকে যবন অত্যাচারে বাস্তু ভিটা পরিত্যাগ করিতে হয় নাই অথচ তাহা হইতে বিশেষরূপে প্রপীড়িত; আবার তাহা হইতে পরিত্রাণের কোন উপায়ই নাই সুতরাং যে মহাপুরুষ অমিত তেজা হইয়াও বিষম বিপদে ও দুঃখে জড়ীভূত হইয়াছিলেন, সেই প্রিয় রামচন্দ্রের সেই সকল অতীত দুঃখকাহিনীই তাঁহার সর্ব্বস্ব—তাই যখন সমাজস্থ সকলেই মর্ম্মপীড়ায় কাতর, তখন তিনি

রামচন্দ্রের দুঃখের সংগীত গাহিয়া সকলকে শান্ত করিতে-ছিলেন—তাই তিনি রামচন্দ্রকে সকলের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া তাঁহারই প্রশান্ত মুখ দিয়া বলাইতেছিলেন "তোমরা কি কষ্ট পাইতেছ—আমার দুঃখের দিকে একবার চাহিয়া দেখ; আমার দুঃখের সহিত কি তোমাদের দুঃখের তুলনা হইতে পারে?" কবিকঙ্কণ ও কৃত্তিবাস দুই জনেই দুঃখের গীত গাহিয়াছেন; দুই জনেই বঙ্গের এক সমাজে এবং আমাদের বিবেচনায় একই সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। তবে দুই জন এক স্থানের কবি নহেন; একজন শান্তিপুরের নিকট বাসী ও অপর জন রায়নার নিকট বাসী হইয়াও মেদিনীপুর প্রবাসী; একজনের কবিত্ব নদীয়া জেলায় স্ফুরিত হয়—অন্য জনের মেদিনীপুর জেলায় নিঃসৃত হয়; সুতরাং দুই জনের পরস্পর পরিচয় হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। বিশেষ তখন সমাজে দুঃখের দশা—তখন সকলেই আপনার প্রাণ লইয়াই ব্যতিব্যস্ত—এমন দুঃসময়ে কি প্রকারে এমন দূরস্থিত দুই জন কবিতে পরিচয় হইতে পারে? কবি-কঙ্কণ প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসরে তাঁহার চণ্ডীকাব্য রচনা সমাপ্ত করেন; সেই পঞ্চবিংশতি বৎসরই তিনি মেদিনীপুর জেলার আড়রা গ্রামে রঘুনাথ রায়ের সভায় ছিলেন; তাহার পর কখন স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন কি না তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না; তবে তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি রায়না থানার অধীন ছোট বৈনান গ্রামে বসবাস করিতেছেন বলিয়া তাঁহার প্রত্যাগমনের কতকটা প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহা হইলে ইহা অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না যে, তিনি ২৫ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় দামুন্যা পরিত্যাগ করেন ও অন্ততঃ ৩০ বৎসর মেদিনীপুরে অবস্থান করেন, তাহার পর

যদি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া থাকেন তখন তাঁহার বয়স ৫৫ বৎসর। তাহা হইলেই প্রত্যাগমনের সময় তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাহার পর এ অঞ্চলে তাঁহার প্রতিপত্তি স্থাপিত হয় সুতরাং জীবিতাবস্থায় শান্তিপুর অঞ্চলে তাঁহার প্রতিপত্তি লাভ করা অসম্ভব; সেই জন্যই কৃত্তিবাস তাঁহার কোন উল্লেখ করিতে পারেন নাই; আবার মুকুন্দরামও এদেশে থাকেন নাই সুতরাং এ দেশের কোন বিশেষ সমাচার রাখিতে পারেন নাই, কাজেই কৃত্তিবাসের কথা তিনি না শুনিয়া থাকিবেন; এই জন্যই কেহ কাহারও নামোল্লেখ করেন নাই। কিন্তু অনেকে বলিয়া থাকেন কৃত্তিবাস কবিকঙ্কণের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী; যদি তাহা হইত, তাহা হইলে কবিকঙ্কণ তাঁহার গ্রন্থের কোন না কোন স্থলে কৃত্তিবাস বা তদীয় রামায়ণের উল্লেখ করিতেন। তাহা নহে, কবিকঙ্কণ ও কৃত্তিবাস এক সময়েই বর্ত্তমান ছিলেন। এক্ষণে যাঁহারা কৃত্তিবাসকে কবিকঙ্কণের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি বলিয়া যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, সেই সকল যুক্তির মধ্য হইতে আমাদের মতের পোষক প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় কি না এবং তাঁহাদের যুক্তি নিচয় অভ্রান্ত কি না, তাহাই দেখিতে হইতেছে।

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের বাসস্থান শান্তিপুরের নিকট ফুলিয়া গ্রাম; তিনি এক স্থানে এই ফুলিয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন; যথা;—

স্থানের প্রধান সেই ফুলিয়ায় নিবাস।
রামায়ণ গান দ্বিজ মনে অভিলাষ॥ অরণ্য কাণ্ড।

ইহাতে জানা যাইতেছে যে, তাঁহার বাসস্থান ফুলিয়া গ্রামে ছিল; কিন্তু তিনি রচনার সময় ফুলিয়ায় ছিলেন না; কেন না

তাহা হইলে "সেই ফুলিয়ায়" না লিখিয়া "এই ফুলিয়া" কিম্বা এই স্থানে অপর কোন শব্দ ব্যবহার করিতেন। যাহাই হউক, তিনি ফুলিয়া গ্রামকে সকল গ্রামের প্রধান বলিয়াছেন; তাঁহার এরূপ বলিবার তাৎপর্য্য কি? জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও গরিয়সী বলিয়াই কি কৃত্তিবাস ফুলিয়ার এত প্রশংসা করিয়াছেন? না ইহার অপর কোন গূঢ় কারণ আছে? অনেকে বলিয়া থাকেন, দেবীবরের মেল বন্ধনে ফুলিয়া মেল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়; এই মেল বন্ধনের পর কৃত্তিবাস তথায় জন্মগ্রহণ করেন সুতরাং তিনি তাহার এত প্রশংসা করিয়াছেন। একথা অসঙ্গত নহে; তবে দেখিতে হইতেছে দেবীবর কোন সময়ের লোক। দেবীবরের মেল বন্ধন কার্য্যের কারণ অনুসন্ধান করিলে, গৌরাঙ্গ দেবের ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বিপ্লবই তাহার মূল বলিয়া আমরা জানিতে পারি; গৌরাঙ্গ প্রভু সর্ব্বসাধারণো ভক্তি মাহাত্মা শিক্ষা দিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মূলে যে কুঠরাঘাত করিয়াছেন—লোকের মনে ধর্ম্ম সম্বন্ধে—জাতিভেদ সম্বন্ধে যে বিপ্লব ঘটাইয়াছেন, দেবীবর আপন ধর্ম্মের পুনঃ প্রাধান্য ও জাতিভেদ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এই মেল বন্ধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন বলিয়াই বোধ হয়; তাঁহার এই মেল বন্ধনই বৈষ্ণব ধর্ম্ম হীন বীর্য্য হইবার এক প্রধান কারণ। যাহা হউক, ইহাতে এই অবগত হওয়া যাইতেছে যে, দেবীবর চৈতন্যদেবের অনেক পরবর্ত্তী লোক; চৈতন্যদেব ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে লোকান্তরিত হন; তাহা হইলে দেবীবর এই সময়েরও অনেক পরে বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্র দেবীবরের সম-সাময়িক লোক ছিলেন (১)।

(১) বঙ্গদর্শন ৪র্থ খণ্ড ২০৩ পৃষ্ঠা দেখ।

নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবের সম কালীন; তাহা হইলে তাঁহারও ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান থাকা সম্ভব; সুতরাং তাঁহার পুত্রের সময় ১৫৩৪+২৬ অর্থাৎ ১৫৬০ খৃষ্টাব্দ বলিয়া আমরা নির্ণয় করিতে পারি; দেবীবর তাহা হইলে এই সময়েই মেল বন্ধন করেন ও এই মেল বন্ধনে ফুলিয়া মেল সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়। দেবীবরের এই কার্য্য বঙ্গদেশময় পরিব্যাপ্ত হইতে অন্ততঃ বিংশতি বৎসর লাগিয়া ছিল; তাহার পর ফুলিয়া মেলের প্রাধান্য সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইলে কৃত্তিবাস সেই গ্রামে জন্ম-গ্রহণ করিয়া আত্ম-গৌরব করিতে পারেন; ইহা হইতেই অনুমান করা যায় যে, কৃত্তিবাস ১৫৬০+২০ অর্থাৎ ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রামায়ণ রচনা করিতে আরম্ভ করেন।

দ্বিতীয়তঃ। দেবীবর ঘটক যে সময়ে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের মেল বন্ধন করেন,তাহার কিছুদিন পরে সেই একই কারণ বশতঃ পুরন্দর বসু খাঁন দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলীন কায়স্থগণের একযায়ী করেন। ইনি কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সম-সাময়িক ছিলেন। পুরন্দর খাঁন ত্রয়োদশ পর্য্যায়স্থিত কায়স্থগণের একযায়ী করেন; এক্ষণে ২৪।২৫ পর্য্যায়েরই অধিক কায়স্থ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা হইলেই একযায়ীর সময় হইতে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থগণের ধারাবাহিক পুরুষ ধরিলে আমরা ১১।১২ পুরুষ প্রাপ্ত হই; সুতরাং ২৫ বৎসর করিয়া প্রতি পুরুষের গণনা ধরিলে ১২×২৫ অর্থাৎ ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে উপনীত হই-তেছি। ১৮৮২ হইতে ৩০০ বৎসর অন্তর করিলে আমরা ১৫৮২ খৃষ্টাব্দ প্রাপ্ত হইতেছি; এই সময়েই পুরন্দর বসু খাঁন বর্ত্তমান ছিলেন ও কৃত্তিবাস এই সময়েই তাঁহার রামায়ণ রচনা করিতেছেন।

তৃতীয়তঃ। কৃত্তিবাস একস্থলে নবদ্বীপের উল্লেখ করিয়া তাহাকে সপ্তদ্বীপের সার বলিয়াছেন যথা ;—

গঙ্গারে লইয়া যান প্রফুল্লিত হইয়া।
আসিয়া মিলিল গঙ্গা তীর্থ যে নদীয়া॥
সপ্তদ্বীপ মধ্যে সার নবদ্বীপ গ্রাম।
এক রাত্রি গঙ্গা তথা করেন বিশ্রাম॥

আদিকাণ্ড। সগর বংশ উদ্ধার।

কৃত্তিবাসের সময় নবদ্বীপ মহা তীর্থ বলিয়া গণ্য হইয়াছে ; নবদ্বীপে কৃষ্ণচৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন বলিয়াই উহা প্রধান তীর্থ ও সেই জন্যই কৃত্তিবাস তাহাকে সপ্তদ্বীপের সার বলিয়াছেন। কৃত্তিবাসের সময় চৈতন্যদেব পূর্ণব্রহ্মের পূর্ণ অবতার বলিয়া গণ্য হইয়াছেন বলিয়া অবগত হওয়া যায় ; না হইলে তিনি নবদ্বীপকে সপ্তদ্বীপের সার বলিবেন কেন ? আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি চৈতন্যদেব গোবিন্দদাসের সমাজে অবতার বলিয়া অভিহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছেন ; কৃত্তিবাসের সময় তিনি পূর্ণ অবতার বলিয়া গণ্য ; তাহা হইলে তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পর অন্ততঃ ৪০।৪৫ বৎসর গত না হইলে আর কখন এরূপ হয় নাই, সুতরাং আমরা কৃত্তিবাসের সময় চৈতন্যদেবের অন্তর্দ্ধানের সময় ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে ৪৫ বৎসর যোগ করিলে ১৫৭৯—৮০ এই সময় প্রাপ্ত হইতেছি ; কৃত্তিবাস এই সময়েই বর্ত্তমান ছিলেন।

চতুর্থতঃ। অনেকে বলিয়া থাকেন "গীত গোবিন্দে" জয়দেব যে লঘু ত্রিপদী ছন্দের অবতারণা করেন, কৃত্তিবাসই প্রথমে সেই ছন্দ বাঙ্গালা ভাষায় আনয়ন করেন ; তৎপরে কবিকঙ্কণ প্রভৃতি অন্যান্য কবিগণ ইহা ব্যবহার করিয়াছেন

এই কথা বলিয়া তাঁহারা কৃত্তিবাসকে কবিকঙ্কণের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রমাণ করেন। কিন্তু আমরা দেখাইব কৃত্তিবাস প্রথমে এই ছন্দ বাঙ্গালায় ব্যবহার করেন নাই; তাঁহার অনেক পূর্ব্বে বৈষ্ণব কবিগণ তাহা প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন; দীর্ঘ ত্রিপদী, লঘুত্রিপদী উভয় প্রকার ছন্দই তাঁহারা ব্যবহার করিয়াছেন; আমরা এই স্থলে অগ্রে তাহাই দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলাম;—

আধ আঁচর খসি, আধ বদনে হাসি,
আধহি নয়ান তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি, আধ আঁচর ভরি,
তব ধরি দগধে অনঙ্গ॥
একে তনু গোরা, কনক কটোরা,
অতনু কাঁচলা উপাম।
হারে হরল মন, জনু বুঝি ঐছন,
পাশ পসারল কাম॥
দশন মুকুতা পাঁতি, অধর মিলায়তি,
মৃদু মন্দ কহতহি ভাষা।
বিদ্যাপতি কহ, অন্তরে সে দুঃখ রহ,
হেরি হেরি না পুরল আশা॥

চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন;—

রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে, থাকিয়ে একলে,
না শুনে কাহারও কথা॥
সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘপানে,
না চলে নয়নের তারা।

বিরতি আহারে, রাঙ্গা বাস পরে,
যেমত যোগিনী পারা॥
এলাইয়া বেণী, খুলয়ে গাঁথনী,
দেখয়ে খসাঞা চুলি।
হসিত বদনে, চাহে মেঘ পানে,
কি কহে দুহাত তুলি॥
এক দিঠ করি, ময়ূর ময়ূরী,
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয়, নব পরিচয়,
কালিয়া বঁধুর সনে॥

আমরা উপরে যে দুইটি কবিতা উদ্ধৃত করিলাম, তাহা লঘু ত্রিপদীর উদাহরণ; বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বঙ্গভাষার আদি কবি; তাঁহাদের রচনাতেও ত্রিপদী ছন্দের অভাব নাই; আমরা এক্ষণে দেখাইব বৈষ্ণব কবিগণ দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহার করিতেও বিরত ছিল না; তাহা দেখাইবার জন্য আমরা গোবিন্দদাস হইতে একটী পদাংশ উদ্ধৃত করিলাম;—

তোমার বিলম্ব দেখি, বলরাম পথে থাকি,
পাঠাইল তোমা আনিবারে।
যাবে কিনা যাবে তথা, দঢ় করি কবে কথা,
বলরামের দোহাই তোমারে॥
যদি বা এড়িয়ে যাই, অন্তরেতে ব্যথা পাই,
চিত নিবারিতে মোরা নারি।
কিবা গুণ জ্ঞান জান, সদাই অন্তরে টান,
একতিল না দেখিলে মরি॥

শুনিয়া শিশুর বাণী, হাসে দেব চূড়ামণি,
মুদিত নয়ান পরকাশে।
গোবিন্দদাসের পঁহু, হাসিয়া হাসিয়া রহু,
চলিলেন বিহারের রসে॥

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই বঙ্গীয় প্রত্যেক প্রাচীন কবিই এই উভয় প্রকার ছন্দই ব্যবহার করিয়াছেন—ভাষা সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতেই উহা প্রচলিত আছে; উহা কৃত্তিবাস কর্ত্তৃক সর্ব্ব প্রথমে বাঙ্গালাভাষায় আনীত হয় নাই। সুতরাং যাঁহারা বলেন কৃত্তিবাসই প্রথমে এই ছন্দ বাঙ্গালাভাষায় আনয়ন করেন ও তৎপরে মুকুন্দরাম ইহা গ্রহণ করেন, সুতরাং মুকুন্দরাম কৃত্তিবাসের ৪০ বৎসর পরবর্ত্তী লোক; কেন না কোন একটী নূতন বিষয় সে কালে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে অন্ততঃ ৪০ বৎসর লাগিত; এই যুক্তির কোন মূল নাই (১)। কাজেই এই ভ্রম পূর্ণ যুক্তিবলে কবিকঙ্কণ কৃত্তিবাসের পরবর্ত্তী হইতে পারেন না। প্রত্যুত উভয়ের রচনাগত সৌসাদৃশ্য দৃষ্টে তাঁহাদিগকে সমকালীন লোক বলিয়াই দৃঢ়রূপে ধারণা হয়।

এক্ষণে দেখিতে হইতেছে কবিকঙ্কণ কোন সময়ের লোক: তিনি তাঁহার কাব্যের একস্থলে লিখিয়াছেন;—

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কতদিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥

ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কবিকঙ্কণ ১৪৯৯ শকাব্দায় বা ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থ রচনা করেন। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি

(১) বঙ্গ দর্শন, ৪র্থ খণ্ড ২০১ পৃষ্ঠা।

কৃত্তিবাস ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন; তাহা হইলে ইঁহারা সম-সাময়িকই হইতেছেন; সুতরাং কৃত্তিবাসকে কবিকঙ্কণ অপেক্ষা ৪০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিবার কোন কারণই দেখিতে পাইতেছি না। তবে এই স্থানে আর একটী তর্ক উত্থাপিত হইতে পারে যে, কবিকঙ্কণ গ্রন্থোৎপত্তি বিবরণে লিখিয়াছেন যে, অম্বররাজ মানসিংহের শাসন কালে, ডিহিদার মামুদসরিফের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ করেন; তাহার পর তাঁহার চণ্ডী রচিত হয়। মহারাজ মানসিংহ ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ পাইয়া এদেশে আগমন করেন, সুতরাং ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে চণ্ডী রচনার কাল ধরিলে উহা মানসিংহের বঙ্গদেশ আগমনের দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়; তাহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি কবিকঙ্কণ গ্রন্থখানি পঞ্চবিংশতি বৎসরে সমাপ্ত করেন; শ্রীযুত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন "তিনি (কবিকঙ্কণ) ১৪৯৫ শকে (১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে) চণ্ডীকাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করিয়া, ১৫২৫ শকে (১৬০৩ খৃষ্টাব্দে) তাহা শেষ করেন (২)।" কিন্তু আমরা উপরে চণ্ডীকাব্য হইতে যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে ১৪৯৯ শকে বা ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থ রচনার কাল বলিয়া জানা যায়; এবং এইটিই অধিক প্রামাণ্য বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু ইহা গ্রন্থ সমাপ্তির কাল নহে—ইহার প্রারম্ভ কাল। কবিকঙ্কণ ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করিয়া ২৫। ২৬ বৎসরে উহা সমাপ্ত

(২) বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা। ১০ পৃষ্ঠা।

করেন, তাহা হইলে মহারাজ মানসিংহের সময় তাঁহার গ্রন্থ রচনার সময়ের মধ্যে পড়িতেছে; সুতরাং গ্রন্থ মধ্যে তাঁহার নামোল্লেখ করা অসম্ভব নহে। মানসিংহ এদেশে আগমন করিবার পূর্ব্বে মহারাজ তোড়রমল্ল মুনিমর্থার সহিত একযোগে বঙ্গরাজ্য অধিকার করেন; কিন্তু পাঠানগণ কিছু দিনের মধ্যেই ইহা পুনরধিকার করিয়া বসেন; এইরূপে সপ্তদশ বৎসর ধরিয়া বঙ্গরাজ্যের জন্য মোগল পাঠানে ভয়ানক যুদ্ধ হয়, পরিশেষে বিজয়লক্ষ্মী সম্পূর্ণরূপে মোগলের অঙ্কবর্ত্তিনী হইয়াছিল। এই সপ্তদশ বৎসর মোগল পাঠানের যুদ্ধে প্রজা পুঞ্জ যে অতিমাত্র নিগৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই; সেই অতি নিগ্রহের সূত্রপাত হইতেই চণ্ডীকাব্যের সূত্রপাত। তৎপরে মানসিংহের কর্ত্তৃত্বকালে কবিকঙ্কণকে স্বজন বন্ধু বান্ধব পরিত্যাগ করিতে হয়; তাই তিনি সকল লোককে চণ্ডীর মাহাত্ম্যে মুগ্ধ করিবার জন্য এই গ্রন্থ চণ্ডীর আদেশ ক্রমে আলিখিত হইল, ইহা সকলকে জানান প্রয়োজনীয় বিবেচনা করতঃ পরে "গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণটি" ইহাতে সংযোজন করিয়া দিয়াছিলেন।

কবিকঙ্কণের বংশধরগণ এক্ষণে ছোট বৈনান গ্রামে ও তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান দামুন্যায় বাস করিতেছেন। কবিকঙ্কণের পর হইতে তাঁহাদের ১১। ১২ পুরুষ হইয়াছে; তাহা হইলে আমরা কবিকঙ্কণকে ১২ × ২৫ অর্থাৎ ৩০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া জানিতে পারি; সুতরাং তিনি ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন ও সেই সময়েই তাঁহার গ্রন্থরচনা করিতেছেন বলিয়া আমরা জানিতে পারি। তৎপরে ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে মহারাজ মানসিংহ এদেশে আইসেন; তাঁহার সময়ে বঙ্গদেশ সম্পূর্ণরূপে

মোগলের অধীন হয়। কিন্তু তাঁহার শাসন কালের শেষ সময়ে কবিকঙ্কণ এদেশে ছিলেন না—তাঁহার রাজ্যারম্ভের সময়েই মামুদসরিফের অত্যাচারে তাঁহাকে পলায়ন করিতে হয়। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি কৃত্তিবাস ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন; এবং তাহাই তাঁহার রামায়ণ রচনা আরম্ভ করিবার কাল। তাহার পর তাঁহাকে আর ছয়টী কাণ্ড রচনা করিতে হইয়াছিল; আবার রচনার সময় তাঁহাকে কথকগণের নিকট হইতে লিখিতব্য বিষয়গুলি সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল, সুতরাং সমগ্র গ্রন্থখানি রচনা করিতে যে তাঁহার ২০ বৎসর লাগিয়াছিল তাহাতে আর সংশয় নাই। তাহা হইলেই কৃত্তিবাস ১৫৮০+২০ এই ১৬০০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রামায়ণ শেষ করেন; প্রায় এই সময়েই অর্থাৎ ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে কবিকঙ্কণের চণ্ডী রচনা সমাপ্ত হয়। তাহা হইলে কবিকঙ্কণ ও কৃত্তিবাস সম-সাময়িকই হইতেছেন।

কৃত্তিবাস অনুবাদক, কবিকঙ্কণ স্বকপোল-কল্পিত আখ্যায়িকা লেখক; আবার শুধু তাই নহে, তাঁহার পূর্ব্বে অপর কোন কবিই কখন আখ্যায়িকা রচনা করেন নাই। কবিকঙ্কণের রচনা অতীব মধুর ও প্রীতিপ্রদ; কেবল বঙ্গীয় ভাবসম্পন্ন এমন সুন্দর মহাকাব্য আর দ্বিতীয় নাই। কবিকঙ্কণ ও কৃত্তিবাস উভয়েই শ্রেষ্ঠ কবি; কিন্তু দুই জনে বিভিন্ন পথাবলম্বী হইবার জন্য, তাঁহাদের ক্ষমতার কিছু তারতম্য হইয়া পড়িয়াছে। উভয়েই অতিশ্রেষ্ঠ কবি, এবং উভয়েই পরবর্ত্তী সমুদায় বঙ্গীয় কবিরই আদর্শস্থানীয়; কবিকঙ্কণের আদর্শে ভারতচন্দ্র, রামেশ্বর, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি এবং কৃত্তিবাসের আদর্শে কাশীরাম, রঘুনন্দন, মধুসূদন, হেমচন্দ্র প্রভৃতি কবিগণ; আবার

এমন কবি অনেক আছেন, যাঁহাদের এই দুই কবিশ্রেষ্ঠই আদর্শ-স্থানীয়; যথা ঘনরাম—রূপরাম প্রভৃতি। যাহা হউক কবি-কঙ্কণ ও কৃত্তিবাসের বার্দ্ধক্য সময়ে যেমন দেশ হইতে নানা অত্যাচার দূর করিবার চেষ্টা হইয়াছে—রাজা তোড়রমল্লের যত্নে রাজস্বের হিসাব ও বন্দোবস্ত হইয়াছে—প্রজাগণ অপেক্ষা-কৃত স্বাস্থ্য ও শান্তিলাভ করিয়াছে, সেইরূপ বঙ্গীয় সাহিত্যও নবীনভাবে সমুদিত হইয়া নবীন উৎসাহে মাতিয়া উঠিয়াছে; তাহার ফল স্বরূপ কবিকঙ্কণের চণ্ডী ও কৃত্তিবাসের রামায়ণ; যেমন দুইটি কাব্যই দুঃখের সময় রচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সেইরূপ দুইটিই ভবিষ্যৎ সুখের আভাস পাইয়া পরি-সমাপ্ত হইয়াছে।

চণ্ডীকাব্যখানি কবিকঙ্কণের সম্পূর্ণরূপে স্বকপোল-কল্পিত; তিনি ইহাতে যে সকল পাত্র প্রবেশ করাইয়াছেন, তৎসকলই নূতন; ও তৎসকলেরই চরিত্রে সুন্দর বৈচিত্র সুরক্ষিত হইয়াছে এবং সমুদায় গুলিই সুন্দর রূপে চিত্রিত হইয়াছে। কবিকঙ্কণের অন্তর বা বাহ্য জগদ্বর্ণনা নৈপুণ্য অতি সুন্দর—মানব স্বভাব পরিজ্ঞানে তিনি যেরূপ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অদ্ভুত; আবার তিনি যে সকল দেব চরিত্র ইহাতে প্রবেশ করাইয়াছেন, সেগুলি সেইরূপ অলৌকিক ও বিকচরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। যদি তাঁহার বাহ্য জগদ্বর্ণনার সুন্দর উদাহরণ দেখিতে চান, তবে পথিমধ্যে ঝঞ্ঝাবাত বিতাড়িত কলিঙ্গ ও মগরারদিকে দৃষ্টিপাত করুন; যদি তাঁহার সুন্দর কল্পনা শক্তির পরিচয় চাহেন, তবে অকূল কালীদহে কমল কাননে কমলাসনা কামিনীর গজগ্রাস ও উদ্গীরণ ব্যাপার কিম্বা সিংহলেশ্বর পশুরাজ সিংহের সভাবর্ণন পাঠ করুন; যদি তাঁহার করুণ রসের অবতারণা দেখিতে

ইচ্ছা হয়, তবে ধনপতির কারামোচন স্থানে উপনীত হউন; যদি দেবতার অলৌকিক ঘটনা দেখিতে চাহেন, তবে মশানে চণ্ডীকার জরতী বেশে অবতরণ ও যোগিনী, প্রেতিনীগণের নৃত্যাদি অবলোকন করুন; আর যদি এই সকলের একত্রে সমাবেশ দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে দুঃখিনী ফুল্লরার নিকট গমন করুন। এইরূপে আমরা চণ্ডীর যে স্থানে পাঠ করিয়াছি সেই স্থানেই তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া প্রীত হইয়াছি; তাঁহার তুল্য কবি বাঙ্গালাভাষায় আর নাই, আবার সামান্য আহ্লাদের বিষয় নহে যে, তিনি প্রাচীন কবি হইলেও তাঁহার আদিরস বর্ণনে কিছুমাত্র অশ্লীলতা নাই; আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি তিনি দুঃখের অবস্থায় চণ্ডীর মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া লোকের চিত্ত তন্ময় করিবার জন্যই চণ্ডীকাব্য রচনা করেন; সুতরাং তাঁহার গ্রন্থে অশ্লীলতা থাকিবে কেন? অশ্লীলতা থাকিলে পাছে তাঁহার গ্রন্থ দুষ্ট হয় এই জন্যই তিনি যত্ন করিয়া তাহা পরিহার করিয়াছেন। যাহা হউক, কবিকঙ্কণ অবিসম্বাদে বঙ্গ কবিরাজ্যে সর্ব্বোচ্চ সিংহাসন পাইবার অধিকারী।

কৃত্তিবাসও সামান্য কবি ছিলেন না; তবে তাঁহার ক্ষমতা বিভিন্ন পথে পরিচালিত হইয়া কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। কোন গ্রন্থের অনুবাদ করিতে গেলে কবির পূর্ণশক্তি তাহাতে সম্পূর্ণ রূপে বিকাশ পায় না; তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা যেন কোন অলক্ষিত বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ থাকে; কবি তখন স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে পারেন না—তাঁহার কল্পনা শক্তির তত প্রসারণ থাকে না—কল্পনা তখন সঙ্কুচিতভাবে সঙ্কীর্ণ রাস্তা দিয়া গমন করিতে থাকে; কবির অমানুষিক শক্তি তখন প্রায় অবরুদ্ধ; সুতরাং সেই অবরুদ্ধ শক্তির সহিত কোন

স্বাধীন শক্তির তুলনা হইতে পারে না ; এবং এই জন্যই কবিকঙ্কণের সহিত কৃত্তিবাসের তুলনা করিতে যাওয়া অন্যায়। কিন্তু কৃত্তিবাস অনুবাদক হইলেও বাল্মিকীর অবিকল অনুবাদ করেন নাই ; ইহাতে তিনি বাল্মিকীর অনেক ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিলেও স্থানে স্থানে নিজের কল্পনাও প্রবেশ করাইয়াছেন ; এমন কি স্থানে স্থানে তাঁহার রামায়ণ, বাল্মিকী রামায়ণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি আদি কবি হইতে তাঁহার কল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সমুদায় কল্পনাতেই প্রায় তিনি নিজের বুকনি মিশাইয়াছেন এবং সেইরূপ করিয়া তাঁহার কাব্য বঙ্গবাসীমাত্রেরই আদরের ধন করিয়াছেন। কৃত্তিবাসের নিজের কল্পনাও যে, বেশ হৃদয় গ্রাহিণী ও মনোহারিণী তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই এবং তাহার প্রসারণও যে অত্যধিক তাহাতেও সংশয় নাই। রামায়ণের স্থানে স্থানে তাঁহার এইরূপ সুকল্পনা শক্তির প্রাচুর্য্য দর্শনে ও তাহাদের মনোহারিত্ব সন্দর্শনে তাঁহাকে কোন ক্রমেই কবিকঙ্কণের নিম্ন স্থানীয় বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার "রামের বন গমনে দশরথের বিলাপ," "সীতাহরণে রামের খেদ," "অশোক কাননে কনকলতা সীতার অবস্থা বর্ণন" প্রভৃতি বিষয়গুলি পাঠ করিলে তাঁহাকে অতি প্রধান কবি না বলিয়া থাকা যায় না। বাস্তবিকই কবিকঙ্কণ ও কৃত্তিবাস উভয়েই শ্রেষ্ঠ কবি, উভয়েই সমান। কিন্তু বঙ্গদেশে রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারত যেরূপ উপকার সাধন করিয়াছেন এমন আর কোন গ্রন্থই নহে ; চণ্ডী প্রভৃতি কাব্য কবিত্বে কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিলেও রামায়ণেরন্যায় কেহই সমাজের উপকারী হয় নাই। যদিও কৃত্তিবাস আদিকবির সারল্য রক্ষা করিতে পারেন

নাই—যদিও রাম-চরিত্র কৃত্তিবাস হস্তে রূপান্তরিত হইয়াছে, তত্রাপি তাহা যে সমাজে মহা উপকার সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহাতে আর সংশয় নাই। ভগবান্ বাল্মিকী যে সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহার সহিত কৃত্তিবাসের সময়ের তুলনার নাম পর্য্যন্তও মুখে আনিতে পারা যায় না; তবে বাল্মিকীর রাম-চরিত্র, কৃত্তিবাস কিরূপে চিত্রিতে সমর্থ হইবেন? তবে যে তিনি তাহাতে অনেকটা কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছেন—ইহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট শ্লাঘার বিষয়—তিনি যে বাল্মিকীর চরিত্র অনেকটা সুরক্ষিত রাখিয়াছেন, ইহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট। বাল্মিকীর কল্পনা রাজ্য যে অদ্ভুত চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা যে কোন ভাষায়, যে রূপেই অনুবাদিত হউক না, সকলেরই মনোমুগ্ধকর হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? তবে কৃত্তিবাস সেই চরিত্র অনেকটা ঠিক রাখিতে পারিয়াছেন ইহাই তাঁহার গৌরবের বিষয়। সুতরাং তাঁহার রামলীলা গান যে দুঃখ সহিষ্ণু—প্রেমপূর্ণ বঙ্গবাসীর অতি আদরের ধন হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? কৃত্তিবাস সেই সময়ে রাম গান যদি না গাহিতেন, তাহা হইলে রামলীলা এতদিনে বঙ্গবাসীর হৃদয়ে কেলী করিত কি না কে বলিতে পারে? কৃত্তিবাসই রাম-চরিত্র ভদ্র হইতে ইতর, জমিদার হইতে দোকানদার পর্য্যন্ত সকলেরই সম্মুখে ধরিয়াছেন—সকলকেই সমান ভাবে শিক্ষা দিতেছেন। তাঁহার রামায়ণই বঙ্গদেশে ধর্ম্মভাব উজ্জীবিত রাখিয়াছে; এখন যে ধনকুবের হইতে কপর্দ্দক বিহীন পর্য্যন্ত প্রতি বঙ্গবাসীরই কণ্ঠে রামচন্দ্র বিরাজ করিতেছেন, তাহার একমাত্র কারণ কৃত্তিবাসের রামায়ণ। রামায়ণ ও মহাভারত বঙ্গদেশে যে কার্য্য সংসাধন করিয়াছে, এমন আর কোন দেশে কোন গ্রন্থই করে নাই। ইয়ু-

রোপে যে কার্য্য বাইবেল ও ধর্ম্ম-প্রচারকগণ, সম্বাদ পত্র ও পুস্তকাগার দ্বারা সম্পাদিত হয়, বঙ্গদেশে তাহা কেবল রামায়ণ ও মহাভারত দ্বারাই সংশাধিত হয়। বাইবেল ইত্যাদি সর্ব্বসাধারণের উপর সমান আধিপত্য করিতে পারে না; কিন্তু বঙ্গদেশে রামায়ণ ও মহাভারত প্রগাঢ় পণ্ডিত হইতে বর্ণজ্ঞান শূন্য ইতর লোক পর্য্যন্ত সকলেরই হৃদয় সুশীতল করে। বঙ্গদেশের সামান্য ইতর লোকেরও, রামচন্দ্রের পিতৃ-সত্য-পালনার্থ অসামান্য স্বার্থত্যাগ, লক্ষ্মণের অসাধারণ ভ্রাতৃস্নেহ, জনক-দুহিতার অতুলনীয়া পাতিব্রত্য, দশাননের পাপ-জনিত সমুচিত প্রায়শ্চিত্য প্রভৃতি রামায়ণের বিষয়গুলি সুন্দররূপে জানা আছে; এবং এই জন্যই সকলেরই হৃদয়-কন্দরে প্রকৃত ধর্ম্ম ভাব নিমজ্জিত আছে। আবার এই কারণ বশতঃই বঙ্গের অতি ইতর লোকও ধর্ম্মজ্ঞানে ইয়ুরোপীয় ইতর লোক অপেক্ষা গরীয়ান্। যে রামায়ণ বঙ্গদেশে এমন মহান্ উপকার সংসাধন করিয়াছে, তাহা যে অতি উৎকৃষ্ট দ্রব্য তাহা কে অস্বীকার করিতে সমর্থ হইবেন? সুতরাং যে সমাজে এমন সুন্দর গ্রন্থ সংরচিত হইয়াছে, সেই সময় যে বঙ্গভাষার পক্ষে মহা কল্যাণকর তাহাই বা না বলিব কেন? কবিকঙ্কণের চণ্ডী শ্রেষ্ঠ কাব্য হইলেও, কৃত্তিবাসের রামায়ণ সকলের আদরের সামগ্রী। দুঃখের সময় সান্ত্বনা প্রদান করিতে, রামায়ণ যেমন সমর্থ চণ্ডী সেরূপ নহে। রামায়ণ রচনায় কবির যাহা সঙ্কল্প তাহা সিদ্ধ হইয়াছে; চণ্ডী রচনার উদ্দেশ্য সম্যক সিদ্ধ হয় নাই, কথন হইবে কি না সন্দেহ।

কবিকঙ্কণের পর কাশীরাম দাসের কাল। এ সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় নানাবিধ কাব্য সংরচিত হইয়াছে—এই

সময়ে কবিকঙ্কণ ও কৃত্তিবাসের আদর্শে অনেক কবি সাহিত্য ক্ষেত্রে দর্শন দিয়াছেন। কাশীরাম প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন; তিনি আনুমানিক ১৬০০ শকাব্দায় বা ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মহাভারত অনুবাদ করেন। সংস্কৃত মহাভারতের তুল্য সুবৃহৎ মহাকাব্য জগতের অন্য কোন জাতীয় কোন সাহিত্যেই বিদ্যমান নাই; বাল্মিকীর রামায়ণ, বা হোমারের ইলিয়াড ও ওডিসি, বর্জ্জিলের ইনিয়াড বা মিল্টনের প্যারাডাইজ লষ্ট ও রিগেন, সেক্ষপীরের নাটক নিচয় বা ওয়াল্টার স্কটের উপন্যাসাবলী কেহই বেদব্যাসের মহাভারতের নিকট দাঁড়াইতে পারে না। সকলেই ইহা হইতে ক্ষুদ্রতম; এমন কি রামায়ণ ব্যতীত অন্য সমুদায় গুলি একত্রিত করিলেও উহার সমান হয় কি না সন্দেহ। মহাভারতের এক একটি পর্ব্ব এক একটি বৃহৎ মহাকাব্য। কাশীরাম সেই বৃহৎ গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন; আবার কেবল অনুবাদ নহে, তিনি সেই অদ্ভুত গ্রন্থের সমুদায় রস ও ভাবই অক্ষুণ্ণ ও তাহার চমৎকারিত্ব অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে সামান্য সৌভাগ্যের কথা নহে। ইংরাজী কবি কাউপার (Cowper) প্রধান কবি হইয়াও ইলিয়াড অনুবাদে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; কিন্তু কাশীরাম দাস মহাভারত অনুবাদে বেশ নিপুণতা দেখাইয়াছেন, সুতরাং কবিসমাজে তাঁহার স্থান নিতান্ত নিম্ন নহে তিনি উর্দ্ধ স্থান লাভ করিবার অধিকারী। কাশীদাস মহাভারত অনুবাদে বেদব্যাসের প্রায় সমুদায় চিত্রই রক্ষা করিয়াছেন, তাহার উপর নিজের কল্পিত দুই একটি নূতন উপাখ্যানও সংযোজিত করিয়াছেন—সেগুলিও বেশ প্রীতিকর হইয়াছে।

অনেকে বলেন সংস্কৃত মহাভারত কেবল বেদব্যাসের প্রণীত নহে; ইহা নানা ঋষি কর্ত্তৃক নানা সময়ে রচিত হইয়াছে। তবে বেদব্যাস ইহার প্রথম ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া যান; তৎপরে অন্যান্য ঋষিগণ কেহ বা একটি অধ্যায়, কেহ বা একটি উপাখ্যান যোগ করিয়া গ্রন্থের কলেবর এতাধিক বর্দ্ধিত করিয়াছেন। আমরা এস্থলে তাহার বিচার করিতে পারি না; তবে মহাভারতের তুল্য বৃহৎ গ্রন্থ যে, পৃথিবীর অন্য কোন জাতীয়সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা নিশ্চয়; কাশীরাম দাস একাকী সেই বৃহৎ গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন ইহা তাঁহার পক্ষে সামান্য শ্লাঘার বিষয় নহে। কিন্তু ইহার প্রতিবাদ স্থলে অনেকে বলেন, কাশীরাম সমুদায় গ্রন্থখানি অনুবাদ করেন নাই; তিনি আদি, সভা, বন ও বিরাট পর্ব্বের কিয়দংশ পর্য্যন্ত অনুবাদ করিয়া পরলোক গমন করেন; তৎপরে তাঁহার জামাতা নন্দরাম ঘোষ ইহা সমাপ্ত করেন। কিন্তু মহাভারতের শেষ পর্য্যন্ত প্রতি কবিতারই শেষ ভাগে কাশীরাম দাসেরই ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায়; নন্দরামের নাম কুত্রাপিও দেখা যায় না; যদি ইনি মহাভারতের প্রায় পঞ্চ-ষষ্ঠাংশ ভাগ অনুবাদ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার নাম কোন না কোন স্থানে সন্নিবেশিত থাকিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু কোন স্থানেই তাঁহার নাম দেখি নাই; আবার মহাভারতের প্রথম তিন পর্ব্বের অনুবাদের সহিত, অন্যান্য পর্ব্বের অনুবাদে কোন পার্থক্যই পরিলক্ষিত হয় না। ইহার সর্ব্বস্থলই সমান লালিত্যময়ী ও সমান তেজস্বিনী; কবিকঙ্কণ বা কৃত্তিবাসের রচনা অপেক্ষা ইহার রচনা সর্ব্বস্থলেই পরিশোধিত, মার্জ্জিত ও পরিপাটী

সুতরাং ইহা দুই জনের রচনা বলিয়া প্রভেদ করিবার কোন উপায়ই নাই ; ইহা যেন একজনেরই লেখনী হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় ; এবং বাস্তবিক তাহাই। এ সম্বন্ধে পণ্ডিতবর রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহাই সঙ্গত। তিনি বলেন, কাশীরাম আদি, সভা, বন ও বিরাটের কতকদূর পর্য্যন্ত লিখিয়া কাশীধাম গমন করেন। মহাভারতে লেখা আছে যে—

আদি, সভা, বন, বিরাটের কত দূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেল স্বর্গপুর॥

আমাদের মতে এই স্বর্গপুরের অর্থ পরলোক নহে, ইহার অর্থ কাশীধাম। হিন্দু-শাস্ত্রমতে পিণাকীর ত্রিশূলোপরি সংস্থাপিত কাশীধাম স্বর্গ সদৃশ। সুতরাং কাশীরাম এই পর্য্যন্ত রচনা করিয়া কাশীধাম গমন করেন ইহাই যথার্থ। যাহা হউক, এ বিষয়ে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। কবিকঙ্কণের সময়ে বাঙ্গালা ভাষা কিছু অপরিষ্কৃত ছিল ; সে সময়ে যে সকল গ্রন্থ সংরচিত হইয়াছে তৎসমুদায়েরই ভাষা কেমন আবর্জ্জনা পূর্ণ—তখন ভাষা যেন মলিন ধূলিময়বসনে আবৃতা ; কাশীরামের সময়ে তাহার বসন পরিষ্কৃত হইয়াছে—যে আবর্জ্জনা রাশি তাহার চতুর্দ্দিকে বিদ্যমান ছিল, তাহা অপসারিত হইয়াছে, সুতরাং তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে হইলে আর কোন কষ্টই হয় না। আমরা এই সময়ের যে কোন গ্রন্থই দেখি না, তাহাতেই এই প্রকার মসৃণ ভাষা দেখিতে পাই। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি কবিকঙ্কণ ও কৃত্তিবাসের আদর্শে অনেক কবি উত্থিত হইয়াছেন ; এই সময়ে সেই আদর্শের ফল প্রথম বিকসিত হয়। কাশীরাম, কৃত্তি-

বাসের আদর্শে তাঁহার সুবৃহৎ মহাভারত এবং ঘনরাম ও রূপ-রাম কবিকঙ্কণ ও কৃত্তিবাস উভয়েরই আদর্শে তাঁহাদের শ্রীধর্ম্ম-মঙ্গল রচনা করেন। রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য এই সময়েই তাঁহার শিবায়ন প্রণয়ন করেন। এই সমুদায় গ্রন্থেরই রচনা বেশ মসৃণ, তবে রামেশ্বরের লেখা কিছু গ্রাম্য দোষে দুষ্ট।

কাশীরামের সময়ে অত্যাচারী আরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহা-সনে অধিষ্ঠিত ছিলেন; হিন্দুগণের প্রতি তাঁহার কিরূপ বিদ্বেষ-ভাব ছিল,তাহা ইতিহাস পাঠকমাত্রেই বিশেষ অবগত আছেন; হিন্দুর উপর জিজিয়া নামক মস্তক কর পূর্ব্বে প্রচলিত থাকি-লেও বাদসাহ কুল-তিলক আকবর সাহ তাহা উঠাইয়া দেন; আরঙ্গজেবের সময় তাহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়; ইহার সময়ে হিন্দুর দেব-দেবী ও দেবালয় সকল ভগ্নীকৃত ও তাহার উপর মসজিদ সংস্থাপিত হয়। এইরূপে আরঙ্গজেবের সময় হিন্দু-গণকে নানারূপে নিগ্রহ সহ্য করিতে হয়; তাঁহার এই অতি নিপীড়নের ফল শিবজীর উত্থান। ঈশ্বর কাহাকেও সম্পূর্ণরূপে যথেচ্ছায় অত্যাচার করিতে দেন না; কেহ ভয়ানক রূপে নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করিলে ঈশ্বর তাঁহার উপযুক্ত দমন প্রেরণ করেন; সৃষ্টির প্রাক্কালাবধি এই নিয়ম চলিয়া আসি-তেছে; তাই আরঙ্গজেবের সিংহাসনারোহণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার দমন স্বরূপ শিবজীর উৎপত্তি। যদি এই সময়ে শিবজী না জন্মিতেন তাহা হইলে আরঙ্গজেবের দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি কিরূপে পরিণত হইত কে বলিতে পারে; সর্ব্বশক্তি-মান পরমেশ্বর আরঙ্গজেবের দুষ্প্রবৃত্তি দমনে রাখিবার জন্যই শিবজীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন; শিবজী অতি দর্পের সহিত সম্রাটের প্রতিযোগিতা করিয়াছিলেন; কিন্তু সে সময়ে বঙ্গ-

দেশে কোন শিবজী জন্মগ্রহণ করেন নাই; সুতরাং বঙ্গদেশ আরঙ্গজেবের সম্পূর্ণ আয়ত্তের অধীন—তিনি তখন এখানে যাহা কিছু মনে করিয়াছেন, তাহাই অবাধে সম্পাদিত হইয়াছে। তাঁহার ভ্রাতা সা-সুজা হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিভেদে বঙ্গদেশ শাসন করিয়া আসিতেছিলেন, তিনি তাঁহাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিলেন—তাঁহাকে আরাকানে দুর্ব্বৃত্ত নর-পিশাচ হস্তে প্রাণত্যাগ করিতে হইল। বঙ্গদেশে আরঙ্গজেবের আর কেহই প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল না, সুতরাং তখন নিরাশ্রয়া বঙ্গভূমি দুর্বৃত্ত আরঙ্গজেবের পৈশাচিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করণের স্থল স্বরূপ হইল—সুতরাং বঙ্গবাসীগণ এই দুঃসময়ে যে কি প্রকারে নিগৃহীত হইয়াছিল, তাহা মনে করিতে গেলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এই দুঃসময়ের কবি কাশীরাম, ঘনরাম, রূপরাম, রামেশ্বর। ইঁহারা সকলেই শিবজীর কথা শুনিয়াছিলেন—তাঁহার জন্য পিশাচ আরঙ্গজেব, দক্ষিণাঞ্চলে আপনার পৈশাচিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারিতেছেন না, তাহাও অবগত হইয়াছিলেন; কিন্তু অন্য কোন উপায় নাই; এদিকে কৃত্তিবাস ও কবিকঙ্কণ পথ খুলিয়া দিয়া গিয়াছেন—লোকের হৃদয়-কন্দরে বীরত্ব বীজ রোপন করিয়া গিয়াছেন—তাঁহাদের মোহন সঙ্গীতে অনেকের হৃদয় উজ্জীবিত হইয়াছে; সেই হৃদয় আরও উর্দ্ধে তুলিবার জন্য মহাভারতের সৃষ্টি। কৃত্তিবাস রামায়ণ অনুবাদ করিয়া, রামচন্দ্রের ন্যায় দয়ার অবতারকে লোকের সম্মুখে ধরিয়া উপদেশ দিলেন যে, রামচন্দ্রের ন্যায় কষ্ট সহিষ্ণু হও—তাঁহার ন্যায় ক্ষমাগুণের আধার হও—তোমাকে যিনি নানারূপে নিপীড়িত করিলেন তাহার প্রতি সদয় হও—বিনা বাক্য ব্যয়ে

তোমার মুখের গ্রাস অপরের পাতে তুলিয়া দাও—রাজ্য-ধন, মানৈশ্বর্য্য—সুখ-সম্পদ সমুদায়ই অপহারককে দিয়া তাহাকে সর্ব্ব প্রকারে সুখী কর; পরিশেষে তোমার ভাল হইবে—এক্ষণে অত্যাচার সহ্য কর, পরিশেষে রামচন্দ্রের ন্যায় তোমার মঙ্গল হইবে—তুমি আবার রাজ্য-ধন, দাস-দাসী, সুখ-সম্পদ সমুদায়ই পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া সুখী হইবে; অতএব রামচন্দ্রের ক্ষমাগুণ শিক্ষা কর; ভরত তোমার রাজ্য কাড়িয়া লইলেও তাহার প্রতি অনুরক্ত হও; পরিশেষে ভরতের ন্যায় তোমাদের সেই পীড়ন কারীও তোমাদের অনুগত হইয়া, তোমাদের মস্তকে রাজচ্ছত্র ধরিবে। কৃত্তিবাসের এই উপদেশ প্রদানের পর অনেক দিন অতিবাহিত হইল, কিন্তু তাহা হইল কই? এক্ষণে ভরতের তুল্য লোক রাজ্যেশ্বর নহে; সেই জন্য তুমি যতই সহ্য করিবে তোমার উপর ততই অত্যাচার হইতে থাকিবে—তুমি ততই নানারূপে নিপীড়িত হইবে, সুতরাং ক্ষমা করিয়া বসিয়া থাকার কাল আর নাই; তাই কাশীরাম লোকের নিকট মহাভারত ধরিলেন; তিনি ইহা দ্বারা উপদেশ দিলেন যে, তোমাদের রাজ্য কাড়িয়া লইলে আর ক্ষমা করিয়া থাকা কর্ত্তব্য নহে; তাহা হইলে তোমাদের যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তৎ সকলও তোমাদের হস্ত হইতে স্খলিত হইবে; এখনও সময় আছে—এখনও আপনাদের স্বত্ব বজায় রাখিতে যত্নবান হও; কতকটা রাখিতে পারিবে। এক্ষণে তোমাদের স্বত্ব রক্ষা করিতে গেলে নানা প্রকার বিবাদ উপস্থিত হইবে; তাহাতে ভয় করিও না; যদিও তোমাদের কোন প্রবল সহায় নাই, কিন্তু তোমরা বিবাদ আরম্ভ কর—তোমাদের সহায়ের অসদ্ভাব হইবে না; পরিশেষে তোমরা হৃতসম্পত্তি সমুদায়

পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া সুখী হইবে। এই দেখ পাণ্ডবগণ বনে বনে বনচরের ন্যায় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, তাঁহাদের তখন কেহই সহায় ছিলেন না; তাঁহারা আসিয়া আপনাদের স্বত্ব চাহিলেন; রাজা তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না—তাঁহাদিগকে সম্মুখ হইতে তাড়াইয়া দিলেন; কিন্তু পাণ্ডবগণ তাহাতে ভীত হইয়া আর পলায়ন করিলেন না—তাঁহারা আপনাদের স্বত্ব রক্ষার জন্য রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিলেন; এই দেখ প্রথমে তাঁহাদের কেহই সহায় ছিলেন না; ক্রমে তাঁহাদের কত অক্ষৌহিণী সৈন্য যুটিল; পরিশেষে স্বয়ং ঈশ্বর তাঁহাদের রথের সারথ্য কার্য্যে ব্রতী হইলেন। এই দেখ কত দিন ধরিয়া যুদ্ধ হইল; পরিশেষে ঐ দেখ রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাদের প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া রাজ্য-ধন, মান-ঐশ্বর্য্য,—সুখ-সম্পদ, দাস-দাসী, পুত্র-কলত্র সমুদায়ই তাঁহাদের পদতলে ন্যস্ত করিয়া প্রাণ ভয়ে দ্বৈপায়ন হ্রদের ভিতর যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, আর পাণ্ডবগণ বিজয়োল্লাসে কেমন উন্মত্ত হইয়া উঠিল। এই চিত্র সকলের সমক্ষে ধরিয়া কাশীরাম বলিলেন, এক্ষণে আর ক্ষমার কাল নাই—অনেক দিন ক্ষমা করিয়া দেখিয়াছ, আর কেন? তোমরা রামচন্দ্রের ন্যায় কার্য্য করিলে কি হইবে—এক্ষণে আর মহানুভব ভরত রাজ্যেশ্বর নহেন—দুর্য্যোধন সিংহাসনে আসীন। তোমরা যতই ক্ষমা করিতে থাকিবে, তোমাদের রাজা ততই হীনবল ভাবিয়া তোমাদিগকে পীড়ন করিতে থাকিবেন। এই সময় একবার পাণ্ডবগণের মত মাথা নাড়া দাও; তোমাদের ইষ্ট হইবে। রাজা প্রজার এই সম্বন্ধ দেখাইবার উদ্দেশেই কাশীরামের মহাভারত প্রণয়ন। রামচন্দ্রের ভাব সমাজের

অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইলেও তাহাতে কোন ফল না দর্শিবার জন্য, তিনি ভীমার্জ্জুনের চরিত্রে সমাজ সংগঠিত করিতে উপদেশ প্রদান করেন। কাশীরামের এই অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্ত সাধনোদ্দেশেই ঘনরাম ও রূপরাম ধর্ম্ম অবতার লাউসেনের বৃত্তান্ত সকলের সমক্ষে ধরিয়াছেন; তাঁহারা বলিতেছেন ধর্ম্মপথে থাকিলে প্রবল প্রতাপান্বিত পাত্র মহামদ বা গৌড়েশ্বরের ন্যায় লোকও তোমাদের নিকট নতমস্তক হইবেন; শক্তির সেবক দুর্ব্বৃত্ত ইছাইও তোমার অনায়াসবধ্য হইবে, অতএব ধর্ম্মপথে থাকিয়া লাউসেনের ন্যায় আপনার স্বত্ব রক্ষার্থে যত্নবান হও; পরিশেষে সুফল প্রাপ্ত হইয়া সুখী হইবে।

কবিগণের এইরূপ উপদেশে সমাজে কিঞ্চিৎ বলাধান হইয়াছিল কি? অবশ্যই হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। গ্রন্থকার বিশেষতঃ কবিগণের উপদেশ, বেত্র হস্ত গুরু মহাশয় বা উচ্চতম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপকের উপদেশ হইতেও অধিক ফলোপদায়ক। ধর্ম্মযাজকগণ বেদীতে উপবেশন করিয়া যে সকল ধর্ম্মনীতি লোকের নিকট উপদেশ প্রদান করেন, কবির উপদেশের নিকট তাহাও অতি সামান্য; যাজকগণের উপদেশ সকল চিরদিন মনকে নিমজ্জিত রাখিতে পারে না—কিছুদিন পরে তাহা ভুলিয়া যাইতে হয়; কিন্তু কবি কোন নায়ককে হাঁসাইয়া—কাঁদাইয়া, তাহারই মুখ দিয়া যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহা আর কিছুতেই বিলুপ্ত হইবার নহে—তাহা চিরদিন লোকের মনে সমান ভাবে রাজত্ব করিতে থাকে; আবার কবিগণের মধ্যে যাঁহাদের কাব্য যত অধিকতর আদৃত ও পঠিত হয়, তাঁহাদের ক্ষমতা অন্যান্য কবি

অপেক্ষা ততই অধিক—তাঁহারা ততই সামাজিক চরিত্র সংগঠনে কৃতকার্য্য হন। কাশীরাম দাস এই শ্রেণীর কবি; তাঁহার মহাভারতের যেরূপ আদর ও চর্চ্চা, বঙ্গভাষায় অন্য কোন গ্রন্থের সেরূপ নহে। সুশিক্ষিত কালেজের উপাধিধারী ব্যক্তি হইতে, অল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত মুদি পর্য্যন্ত সকলেই মহাভারতের সেবক। এমন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সেই ভয়ানক নির্য্যাতনের সময়েও যে, আদৃত ও পঠিত হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই; সুতরাং তাঁহার উপদেশ নিচয় যে, সে সময়ে সমাজের স্তরে স্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ কি? এবং সমাজ যে এই সকল উপদেশে অনেক বল প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহাতেই বা আশ্চর্য্যের বিষয় কি? কাশীরামের এইরূপ উপদেশ প্রদানের পর হইতেই বঙ্গীয় সমাজ নব-জীবন লাভ করে; কিন্তু সমাজ নব-জীবন লাভ করিতে আরম্ভ করিয়া কখন দুই বা চারি বৎসরে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে পারে না; কথঞ্চিৎ সজীবতা লাভ করিতে অন্ততঃ পঞ্চাশৎ বৎসর কাল প্রয়োজন। আমরা এই জন্যই কাশীরামের পঞ্চাশৎ বৎসর পরে সমাজের বিভিন্ন প্রকৃতি পরিদর্শন করি।

সমাজে নূতন জীবন প্রবেশ পথ পাইলে শাসন কর্ত্তাগণ তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং তদবধি তাঁহারা হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিভেদে দেশ শাসনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; মুরশিদকুলিখাঁর সময় হিন্দু মুসলমান উভয়েই প্রায় সমান হইয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু তখনও হিন্দু সমাজে বিশেষ বলাধান করে নাই, তাহাতেই তখনও মুসলমানগণের আধিপত্য একটু বেশী ছিল; এস্থলে ইহাও বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, মুরশিদ বাল্যকালে হিন্দু ছিলেন, ব্রাহ্মণ বংশে তাঁহার জন্ম। যাহাইহউক, তাঁহার সময়ে ইংরাজ

বণিকগণ বঙ্গদেশে বদ্ধমূল হইয়াছেন; তাঁহাদের প্রতাপ মুসলমানগণকে ধাঁধাঁইয়া দিয়াছে সুতরাং এ সময়ে বঙ্গীয় হিন্দু প্রজাগণ মুসলমানের উপর বিরক্ত থাকিলে নানা রূপ অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা, এই আশঙ্কায় তাঁহারা এই সময়ে হিন্দুগণকে অধিক উৎপীড়ন করিতে সাহসী হন নাই; তাই দেখিতে পাই, এই সময়ের হিন্দুগণ কিছু শান্তি সুখ লাভ করিয়াছে। মুরসিদের পর সুজাউদ্দীন বাঙ্গালার নবাব হন; ইনি হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন; ইনিই দিল্লী হইতে "রাইরাঁইয়া" উপাধি আনাইয়া আলমচাঁদকে প্রদান করিয়া প্রথমে সম্মানিত করেন। সুজাউদ্দীন প্রজা শাসনের জন্য চারিজন সদস্য লইয়া একটি মন্ত্রীসভা সংস্থাপন করেন; ইহাতে দুইজন হিন্দু ও দুইজন মুসলমান স্থান লাভ করিয়াছিলেন, সেই হিন্দুগণের নাম জগৎ শেঠ ও রায় আলম চাঁদ। আবার ইঁহারই শাসন কালে, রামেশ্বরের আশ্রয় দাতা মেদিনীপুর জেলাস্থিত কর্ণগড়াধিপতি মহারাজ যশোবন্ত সিংহ দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া ঢাকা নগরে গমন করেন। নবাব মুরসিদের সময়ে দেশীয় অনেক জমিদার রাজস্বের জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, সুজা তাঁহাদিগকে মুক্তি প্রদান করেন; এই সকল দৃষ্টে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয় যে, এই সময়ে হিন্দুগণ আর পূর্ব্বের ন্যায় উৎপীড়িত না হইয়া মুসলমান প্রজার সহিত সমান সূত্রে গ্রথিত হইতেন। সুতরাং এই সময়ের হিন্দু সমাজে বিলাস প্রবেশ পথ পাইয়া ছিল; সুজাউদ্দীন নিজে অতিশয় বিলাসী ছিলেন; সুতরাং তাঁহার দৃষ্টান্ত সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হইল; প্রজা সাধারণ বিলাসী হইয়া উঠিলেন। প্রজাগণ কতকটা শান্তি সুখ লাভ করিয়াছিল বলিয়াই বিলাস

তাঁহাদের মন আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছিল সন্দেহ নাই। এক্ষণকার হিন্দুগণ আর পূর্ব্বের ন্যায় নিতান্ত নিৰ্ব্বীর্য্য ছিলেন না। কাশীরাম দাস প্রভৃতির উত্তেজনায় হিন্দুসমাজে বলাধান হইয়াছিল—হিন্দুগণ আপনাদের স্বত্ব বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; সুতরাং এই সময়ে নবাব হিন্দুগণকে কিঞ্চিৎ ভয় করিতেন। এই জন্যই শুজা মৃত্যুর সময় তদীয় পুত্র সরফরাজকে আলম চাঁদ ও জগৎশেঠের পরামর্শ মত কার্য্য করিতে শপথ করাইয়া যান। শুজা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালীগণ আর পূর্ব্বের ন্যায় নিৰ্ব্বীর্য্য নহে; তাই তিনি পুত্রকে এ বিষয়ে সাবধান করিয়া দেন। কিন্তু উদ্ধত স্বভাব সরফরাজ্ ইঁহাদিগকে বিশেষ মান্য করিলেও কোন কারণ বশতঃ তাঁহাদের বিরাগ ভাজন হইয়া পড়েন; সরফরাজ্ কোন বিশেষ কারণ বশতঃ জগৎশেঠ ও তদ্বংশীয়গণের ক্রোধোদ্দীপন করিয়া দেন—সেই জন্যই তাঁহার আলিবর্দ্দীর হস্তে পতন। যাহা হউক, এই সকল দৃষ্টে বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে যে, তখন বঙ্গীয় সমাজ নিতান্ত হীনবল ছিল না এবং এরূপ হইবার কারণ বঙ্গীয় কবিগণের ক্রমিক উপদেশ ও ইংরাজ, ফরাসী বণিকগণের দৃষ্টান্ত প্রভৃতি ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? তাহা হইলেই দেখা গেল কাশীরাম, ঘনরাম, রূপরাম, রামেশ্বর প্রভৃতি কবিগণ বঙ্গ সমাজে যুগ প্রলয় সংসাধন করিয়াছিলেন।

কাশীরাম দাসের পর ভারতচন্দ্রের কাল; এই সময়ে আলীবর্দ্দীখাঁ বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত; ইঁহার সময়ে বর্গীর হাঙ্গামা প্রভৃতি দুই একটি উপপ্লব ঘটিলেও প্রজাগণ সাধারণতঃ সুখে ছিলেন; এ সময়ে রাজার পীড়ন ততটা প্রবল ছিলনা বলিয়াই, প্রজাগণ কিয়দংশে শান্তি সুখলাভ করিতে পারিয়া

ছিলেন—কিয়দংশে বিলাসের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই শান্তিসুখসমন্বিত বিলাসী হৃদয়ের ফল বিদ্যাসুন্দর। চণ্ডীকাদেবীর মূর্ত্তি বিশেষ এই সমাজের পূজ্য ছিল; সুতরাং এই সময়ের আমরা যে কোন গ্রন্থই দেখি না, তাহাতেই কালিকাদেবীর আবির্ভাব সন্দর্শন করিতে পারি। পূর্ব্ব হইতেই তন্ত্র সমাজে স্থান লাভ করিয়াছিল, কিন্তু মুসলমানগণের অতি নিপীড়নের সময়ই ইহা কিঞ্চিৎ হীনপ্রভ হয়, এক্ষণে সমাজের এই শান্তিময় অবস্থায় তাহা দ্বিগুণতেজে আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করিতে লাগিল; এই সময়ে অধিকাংশ লোকই তন্ত্রোপাসক হইলেন। সুতরাং এই সময়ের সমুদায় গ্রন্থই কালীদেবীর প্রাধান্য ও উপাসনা খ্যাপন করিয়াছে। সমাজ এই সময়ে সুরায় প্রমত্ত ছিল বলিয়াই বোধ হয়; কেন না সুরা তন্ত্রের প্রধান অঙ্গ। আমরা এই সময়ের দুই একজন কবিকেও সুরাপান করিতে দর্শন করি। রামপ্রসাদ সেন সুরাসেবী ছিলেন। যাহা হউক, এই কালের ভাষা সুরাপায়ী ব্যক্তির উদার মুক্তকণ্ঠের ন্যায় সরল ও সুমধুর; ইহাতে কোনরূপ আবর্জ্জনা নাই—সর্ব্বত্রই সুপরিষ্কৃত ও মসৃণ। ভারতচন্দ্রের সময় হইতেই বাঙ্গালাভাষা নূতন কালে প্রবেশ লাভ করিয়াছে; ভারতচন্দ্রই ইদানীন্তন কালের প্রথম কবি; ভাষার উপর তাঁহার যত ক্ষমতা ছিল, তেমন অন্য কাহারও দেখা যায় না। যেন ভাষা তাঁহার মুষ্টির ভিতরে অবস্থিত; তিনি ইচ্ছামত কখন তাহাকে হাসাইয়াছেন—কখন নাচাইয়াছেন এবং এইরূপ করিয়া তিনি সকলেরই মনোরঞ্জন করিয়াছেন; তাঁহার ন্যায় শব্দ বিন্যাস করিতে এ পর্য্যন্ত কোন কবিই সমর্থ হন নাই। অনেকে বলেন ভারতচন্দ্রই বঙ্গভাষার সর্ব্বপ্রধান

কবি; কিন্তু এ কথায় আমরা আস্থা সম্পন্ন হইতে পারি না; মুকুন্দরামের ক্ষমতার নিকট ভারতচন্দ্র তিষ্ঠিতেও পারেন না। ভারতচন্দ্র প্রায় সকল স্থলেই মুকুন্দরামের অনুকরণ করিয়াছেন; তাঁহার অন্নদামঙ্গল খানি সম্পূর্ণরূপে অনুকরণের উপরেই স্থাপিত। গুণাকরের অন্যান্য নানাগুণ থাকিলেও কোন নূতন বিষয় অবতারণা করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিলনা; অন্নদামঙ্গলে কোন নূতন চরিত্র নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; ভারতচন্দ্রের কল্পনা শক্তি কোন নূতন মূর্ত্তি উদ্ভাবন করিতে পারে নাই; তাঁহার কল্পনা তত প্রখরা ছিল না; তবে অপরের কবির চিত্র তিনি সুন্দর বর্ণে চিত্রিত করিতে পারিতেন; কোন একটী অসম্পূর্ণ চিত্র তাঁহার সম্মুখে পতিত হইলে, তিনি তাহার মনোহর অঙ্গরাগ করিতে পারিতেন—তাহাকে নানাবিধ রমণীয় বেশ ভূষায় সাজাইতে পারিতেন—তাহাকে সুন্দর রঙ্গে রঞ্জিত করিতে পারিতেন; এই জন্যই তাঁহার অনুকরণ মূল হইতেও স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তির অভাব থাকিলেও, রচনা শক্তির প্রাখর্য্য বশতঃ তাঁহার কাব্য সকলেরই হৃদয়াকর্ষণ করিয়াছে; সেই জন্যই তিনি কবি সিংহাসনের উচ্চাতারণে অবস্থিত হইয়াছেন; তাঁহার কাব্যকুসুমসৌরভে দিগ্বিদিক আমোদিত হইয়াছে; বাস্তবিক ভারতচন্দ্র একজন অদ্বিতীয় কবি ছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই; ভাষা তাঁহার যেরূপ আয়ত্তাধীন, এরূপ অন্য কোন কবির ছিল কি না সন্দেহ। ভারতচন্দ্রের রচনা অতীব সরল ও কোমল; যেন তাঁহার সময়ে বাঙ্গালা ভাষা নব যৌবনে পূর্ণ বিকসিত; সর্ব্বত্রই লাবণ্যময়ী—সকল অঙ্গই আপনার প্রভায় ঢল ঢল করিতেছে। বাস্তবিকই

তাঁহার রচনা যেমন চিত্তহারিণী, তেমনিই প্রভাময়ী; ইহাতে প্রাবৃটের বিদ্যুল্লতার বিকাশ নাই, ইহার সর্ব্বত্রই বাসন্তীর মলয় মারুতের সুমন্দ উচ্ছ্বাস; ইহার কোন স্থানেই রণ-ভেরীর ভয়াবহ গর্জ্জন নাই, সকল স্থানেই মুরলী বীণার মধুর নিক্কণ আছে; মৃদঙ্গের পরিবর্ত্তে, তল মৃদঙ্গের মধুরধ্বনি ইহার সর্ব্বত্রই শ্রুত হওয়া যায়; সুতরাং ভারতচন্দ্র বীররসে মত্ত কালকেতু চিত্রিত না করিয়া, বিলাস রসে রসিক আদিরস মত্ত সুন্দর আঁকিয়াছেন; ফুল্লরার পরিবর্ত্তে বিদ্যা আনিয়াছেন।

আমরা দেখাইয়াছি কবিকঙ্কণের সময়ে বঙ্গীয় সমাজ কি প্রকার দুঃসহ যন্ত্রনা পাইতেছিল—কবিকঙ্কণ কি উদ্দেশ্যে চণ্ডীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে বঙ্গীয় সমাজের আর সে অবস্থা নাই; এক্ষণে আলিবর্দ্দী বঙ্গীয় সিংহাসনে আসীন—বিলাস রসের অবতার কৃষ্ণচন্দ্র রায় নব-দ্বীপের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত; তাই আদিরস প্রমত্ত ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, গোপাল ভাঁড় তাঁহার প্রধান সভাসদ। তখন আর বঙ্গের সে দুঃখের অবস্থা নাই—তখন বঙ্গের চতুর্দ্দিক হইতে অত্যাচার জনিত হাহাকার শব্দ অশ্রুত হইয়াছে—বঙ্গবাসী তখন কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিয়াছেন—অনেক দিনের পর আর একবার সুখের আস্বাদ পাইয়াছেন; সুতরাং তাহা হইতে আর নিবৃত্ত হইতে পারিতেছেন না—সুখের স্রোতে একবার গা ভাসাইয়া দিয়াছেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সুখের উৎস স্বরূপ; বঙ্গবাসী সেই উৎস জলে সন্তরণ দিতেছেন। আবার বাঙ্গালী শান্তিলাভ করিলেই বিলাসী হইয়া পড়েন; বিলাসই বঙ্গবাসীর চিরন্তন অভ্যস্তধর্ম্ম; এই বিলাস পরায়ণতার জন্যই বঙ্গসমাজ নানা সময়ে,নানারূপে নিপী-

ড়িত হইয়াছে; এই জন্যই রত্ন-প্রসবিনী বঙ্গভূমি নানা রত্ন প্রসব করিলেও বীর রত্ন প্রসব করেন নাই; রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় সুখের সময়—শান্তির সময়—তাই এ সময়ে বিলাস বিশেষ রূপে আপনার আধিপত্য প্রকাশ করিয়াছিল; সেই বিলাসের বিশেষ প্রভুত্ব খ্যাপনের ফল বিদ্যাসুন্দরের অশ্লীল উপাখ্যান। এই সময়ে আমরা ভারতচন্দ্র কেন, নানা লোক প্রণীত বিদ্যা-সুন্দর দেখিতে পাই। এই সমাজের রাজা হইতে দরিদ্র প্রজা পর্য্যন্ত সকলেরই, এই বিদ্যাসুন্দরে সমান আনন্দ—সমান তৃপ্তি—সমান প্রীতি। রাজা এই রুচির প্রশংসা করিতেছেন—প্রজা সাধারণ করিতেছেন, সুতরাং উপর্য্যুপরি চারিখানি বিদ্যাসুন্দর সংরচিত হইল। এই সমুদায়ই তদানীন্তন কদর্য্য সামাজিকতার ফল; সমাজ অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ—তদানীন্তন গ্রন্থ সকলও তাই; ভারতচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই কালীকা দেবীর প্রাধান্য ও মাহাত্ম্য খ্যাপন করিতে সমুৎসুক, কিন্তু এই কারণ বশতঃই তাঁহারা আপনাপন গ্রন্থে এত অশ্লীলতা পৃষ্ট আদিরসের ছড়াছড়ি করিয়াছেন। এই জন্যই ভারতচন্দ্র চণ্ডীকাব্য হইতে সৃষ্টিপ্রকরণ অবধি হর-পার্ব্বতীর সমুদায় বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিলেও, চণ্ডীর মাহাত্ম্য খ্যাপক কালকেতুর আখ্যায়িকার পরিবর্ত্তে, আদিরস পূর্ণ বিদ্যাসুন্দরের উপখ্যান গ্রহণ করিয়াছেন; উভয়ের উদ্দেশ্য সমান হইলেও বিভিন্ন সামাজিকতার জন্য, উভয়েরই কল্পনা বিভিন্ন পথে দাঁড়াইয়াছে। এই অশ্লীল কল্পনায় ভারতচন্দ্রের কিছুমাত্র দোষ নাই; ইহা সময়ের সমাজের দোষ। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভায় যেরূপ গোপাল ভাঁড় প্রভৃতি বিদূষকগণের অশ্লীল রসালাপের বিষয় জনপ্রবাদ আছে, তাহাতে তাঁহাকে অশ্লীলতাপ্রিয়

রাজা বলিয়াই বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়; সুতরাং তাঁহার প্রিয় কবিগণ কেন না আদিরসে নিমজ্জিত হইবেন? তখন সাধারণ লোকের প্রবৃত্তিও এইরূপ; সুতরাং এরূপ গ্রন্থ সে সময়ে যে বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি? এই জন্যই এ সময়ে কবিকঙ্কণ চণ্ডী উপেক্ষিত হইয়া অন্নদামঙ্গল সিংহাসন লাভ করিয়াছে; সেই অবধি বঙ্গভাষায় কেমন এক প্রকার একটানা বহিতেছে যে,তাহা আর কিছুতেই নিবৃত্ত হইতেছে না। ভারতচন্দ্রের সময় হইতেই বঙ্গভাষায় প্রেমের গীতি স্থান লাভ করিয়াছে; তদবধি অন্যান্য কাব্য সুদূরে প্রক্ষিপ্ত হইয়া গীতি কাব্যের আদর বাড়িয়াছে—গীতি কাব্য সিংহাসন অধিকার করিয়াছে; এক্ষণে যে আমরা বঙ্গ ভাষায় শত শত গীতিকাব্য দেখিতে পাই, তাহা এই সামাজিকতার প্রসাদে। ভারতচন্দ্রের সময়ে সমাজ যে প্রকার নিশ্চেষ্ট—সুখপরায়ণ ও আদিরসে বিভোর, সেইরূপ তাঁহার কবিতা কলাপ যে, সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? তাহার উপর ভারতচন্দ্র একজন যথার্থ কবিত্বগুণ সম্পন্ন কবি ছিলেন; যদিও তাঁহার কল্পনার কোন অদ্ভুত প্রসারণ ছিল না ও তাহা কোন নূতন চিত্র উদ্ভাবন করিতে পারে নাই, তত্রাপি তিনি অপরের কল্পিত চিত্রগুলি যেরূপ বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন—যেরূপ নানাবিধ বেশ ভূষায় সুশোভিত করিয়াছেন, তাহাতে সে গুলি অপর হইতে গৃহীত ইহা জানিবার কোন উপায়ই নাই; যেন সে গুলি তাঁহারই নিজের কল্পিত চরিত্র। যাহা হউক, ভারতচন্দ্র বঙ্গভাষার একজন প্রধান কবি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; অশ্লীলতা দুষ্ট স্থানগুলি পরিত্যাগ করিলে, তাঁহার রচনা অতীব প্রীতিপ্রদ। ভারতচন্দ্র

চারিখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন যথা, অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ, ও রসমঞ্জরী; এতদ্ব্যতীত তাঁহার সত্যনারায়ণের কথা, সংস্কৃত নাগাষ্টক, চণ্ডী নাটক প্রভৃতি অনেক খণ্ড কবিতা আছে। ভারতচন্দ্রের অনেক রচনা সংস্কৃত, হিন্দী, পারসী ও উর্দ্দ মিশ্রিত; ইহাতে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়, তিনি ঐ সকল ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

ভারতচন্দ্রের সময়ে ইয়ুরোপীয়গণ ভারতে বদ্ধমূল হইয়াছেন। ইংরাজগণ বঙ্গদেশে শনৈঃ শনৈঃ আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিতে অগ্রসর হইতেছেন; তাঁহারা তখন নানা স্থানে কুঠি সংস্থাপন,—নানা স্থানে জমিদারী গ্রহণ ও কলিকাতায় তাঁহাদের প্রধান আড্ডা স্থাপন করিয়াছেন; তথায় দুর্গ নির্ম্মিত ও তাহাতে অনেক ইংরাজ সৈন্য রক্ষিত হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশে বাণিজ্যের জন্য তাঁহাদিগকে যে তিন সহস্র টাকা বার্ষিক শুল্ক স্বরূপ দিতে হইত, নবাব তাহা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করায়, ইংরাজগণ তাহা লইয়া মহা হুলস্থূল করিয়া আপনাদের অভীষ্ট সংসাধন করিয়া লইয়াছেন; তাঁহারা বঙ্গদেশের অবস্থা—প্রজার অবস্থা—রাজার অবস্থা ও বল বিশেষরূপে বুঝিয়া লইয়াছেন এবং বঙ্গভূমি তাঁহাদের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিলে তাঁহারা কিরূপ লাভবান হইতে পারেন, তাহাও সেই সামান্য দিনের বাণিজ্যেই বেশ পরিজ্ঞাত হইয়াছেন; সুতরাং একজন সূক্ষ্মদর্শী লোক ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বেই বলিতে পারিতেন যে, মুসলমান ভাস্কর অস্তগতপ্রায় হইয়া আসিয়াছে; মুসলমান রাজ্যাবসানের আর অধিক বিলম্ব নাই।

মুসলমানগণও ঐ সময়ের মধ্যেই ইংরেজের বল বিক্রম

বুঝিতে পারিয়াছিলেন; তাহার উপর, বঙ্গবাসীগণ তাঁহাদের সহিত যোগ দিলে কি হইবে তাহাও বুঝিয়াছিলেন; তাই ইংরাজের বঙ্গদেশ প্রবেশের প্রায় প্রথম হইতেই, তাঁহাদিগকে দূরীভূত করিয়া দিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণে তাহাতে কৃতকার্য্য হন নাই। পরে যখন নবাবগণ দেখিলেন, ইংরাজ বণিক বঙ্গদেশে বদ্ধমূল হইলেন, তখন আর বঙ্গীয় প্রজার সহিত সদ্ভাব না রাখা বিপদ-জনক। এই জন্যই চির অত্যাচারী মুসলমানগণ হিন্দু প্রজার প্রতি সদয় হইয়াছিলেন; তাহাতেই দুই একজন বঙ্গবাসীকে প্রধান প্রধান পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দীর সময়ে হিন্দু মুসলমান একই সূত্রে গ্রথিত; সকলের সহিত তাঁহার সমান সদ্ভাব ছিল; কিন্তু তৎপরেই ভীষণ প্রকৃতিক সেরাজুদ্দৌলা বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করিলেন; তাঁহার নিকট হিন্দু, মুসলমান সকলেই সমান রূপে পীড়িত, সুতরাং সকলেই তাঁহার উপর বীতশ্রদ্ধ—সকলেই তাঁহার ধ্বংশ কামনায় সমান উৎসুক; সেরাজুদ্দৌলার এইরূপ অত্যাচারই তাঁহার অধঃপতনের কারণ। শেষ মুসলমান নবাবের এইরূপ অত্যাচারের ফল, মুসলমান রাজত্বের ধ্বংশ ও ইংরাজ বণিকবৃন্দের রাজ্য লাভ। এই ভয়ানক রাষ্ট্র বিপ্লব ভারতচন্দ্রের অব্যবহিত পরে সংসাধিত হয়; সুতরাং আমরা এস্থলে আর তাহা উল্লেখ না করিয়া ভারতচন্দ্রের সম-সাময়িক অন্যান্য কবির বৃত্তান্ত প্রদান করিব। এই সময়ের অপর কবি অনুসন্ধান করিলে আমরা কৃষ্ণরাম দাস, রামপ্রসাদ সেন, প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি অনেককে দেখিতে পাই। কৃষ্ণরাম দাস কায়স্থ কুলোদ্ভূত—রামপ্রসাদ সেন বৈদ্য বংশজ ও প্রাণরাম ব্রাহ্মণ;

ইঁহারা সকলেই বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছেন। রাম প্রসাদের বিদ্যাসুন্দর ব্যতীত কালী-কীর্ত্তন, কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, কালিকা-মঙ্গল প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ আছে; কিন্তু তাঁহার প্রণীত গীতগুলিই তাঁহার অমরত্বের নিদান; বাঙ্গালাভাষা যত দিন জীবিত থাকিবে, ততদিন রামপ্রসাদ কেবল ইহার জন্যই সকলের প্রীতি পুষ্পাঞ্জলি প্রাপ্ত হইবেন; কৃষ্ণরাম দাস কবিত্ব শক্তি বিষয়ে বিশেষ প্রভাবিত না থাকিলেও সামান্য কবি ছিলেন না; বিশেষতঃ তিনি যখন সর্ব্ব প্রথমে বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছেন, তখন তিনি বিশেষ রূপে মান্য পাইবার উপযুক্ত; তাঁহার রচনা ভারতচন্দ্রের রচনার ন্যায় সুমিষ্ট ও সুললিত, পরিপাটী ও মার্জ্জিত। রামপ্রসাদ একজন প্রধান ভক্ত ছিলেন; আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাঁহার প্রণীত অনেক গ্রন্থ থাকিলেও তৎকৃত পদাবলীই তাঁহার অমরত্বের নিদান; সেই গীতগুলি অতীব মনোহর ও প্রীতি উন্মেষক: দেখিলেই বোধ হয়, যেন সেগুলি একজন যথার্থ ভক্ত সুকবির মর্ম্মস্থল হইতে আপনা হইতেই নিঃসৃত হইয়াছে; তাহাতে কিছুমাত্র কাঠিন্য নাই—কষ্ট কল্পনার লেশ মাত্র নাই, যেন সকল গুলিই সরলতা গ্রথিত—যেন সকলগুলিই অন্তরের নিভৃত কক্ষস্থিত ভক্তি পুষ্পে সংরক্ষিত; তাঁহাকে কোন কথা ভাবিতে হয় নাই—কোন উপমা অনুসন্ধান করিবার জন্য আকাশের দিকে চাহিতে হয় নাই—তিনি সম্মুখে যাহা পাইয়াছেন তাহাই তাঁহার উপমার স্থল—তাহা হইতেই তিনি ভক্তি কুসুম চয়ন করিয়া মালা রচিয়াছেন।

রামপ্রসাদ একজন প্রধান ভক্ত ও প্রধান কবি ছিলেন; তাঁহার মত ভক্ত কবি আর দেখিতে পাই না; সুতরাং তাঁহার

কৃত ভক্তির উৎস স্বরূপ পারমার্থিক পদাবলী যে, অতীব প্রীতিকর ও মনোহর হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? বাস্তবিকই যখন আমরা নিশীথ কালের নিস্তব্ধ অবস্থায় তাঁহার গীতাবলী শ্রবণ করি, তখন মনে যে কি অভূত পূর্ব্ব ভাবের উদয় হয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। রামপ্রসাদের এই অকৃত্রিম গীতগুলিতে বাহ্যাড়ম্বরের ঘোর ঘটা নাই—সেগুলি রচনা করিবার সময় তাঁহাকে নানাবিধ উপকরণ আনিবার জন্য দেশ দেশান্তরে গমন করিতে হয় নাই। তাঁহার গীতা-বলী তাজমহল নহে, সুতরাং তাহা প্রস্তুত করিবার জন্য সমু-দায় আসিয়া, ইয়ুরোপ ভ্রমণ করিতে হয় নাই—যেখানে যাহা কিছু রত্ন আছে, তাহা আনিবার জন্য যত্ন পাইতে হয় নাই; তাঁহার গীতাবলী একটী সামান্য পর্ণ কুটীর মাত্র; দেশীয় মৃত্তিকা—দেশীয় বংশ পত্রাদি ভিন্ন অন্য উপকরণ আর কিছুই নাই; ইহাতে কারুকার্য্যের প্রাচুর্য্য নাই; সকলই যেন স্বভাবের হস্ত হইতে বিনির্গত হইয়াছে। কোলাহল পূর্ণ মহা-নগরীর অত্যুচ্চ সৌধমালা সন্দর্শনের পরই, প্রকৃতি দেবীর বৈচিত্র্যময়ী কাননের মধ্যস্থিত লতাকেতন সন্দর্শন করিলে মনে যে প্রকার অতুল আনন্দের উদয় হয়, এক্ষণকার নানা-বিধ বৈদেশিক ভাব মিশ্রিত সুন্দর কাব্য কলাপ পাঠান্তে, রাম-প্রসাদের পদাবলীকুঞ্জে প্রবেশ করিলে মনে ঠিক সেইরূপ ভাবের উদয় হইয়া থাকে; ইহাতে মহানগরীর কোলাহল নাই—সুপরিষ্কৃত গৃহরাজির রাজীব শোভা নাই—দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত হৈমময় সিংহদ্বার নাই; ইহাতে নগরের কুটিলতা—পরশ্রী কাতরতা নাই; ইহার সকলই সরলতা, সকলই উদা-রতা, সকলই স্বাভাবিক। ইহাতে জন কোলাহলের পরিবর্ত্তে,

স্বভাবজাত পাদপ রাজির মনোমুগ্ধকর মর্ম্মর শব্দ আছে—কৃত্রিম সরিতের কৃত্রিম শোভার পরিবর্ত্তে, অকৃত্রিম উৎসের অকৃত্রিম শোভা আছে; ইহার কোথাও গ্যাস বা তাড়িতালোক নাই—ইহার সর্ব্বত্রই পৌর্ণমাসীর রজত ছটা। যাহা হউক, রামপ্রসাদের পদাবলী সকল সম্পূর্ণ রূপে অকৃত্রিম; সেগুলি যেন কবির লেখনী হইতে অনর্গল নিঃসৃত হইয়াছে। তাঁহার কল্পনা সুরঞ্জিত করিবার জন্য তাঁহাকে ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে হয় নাই; তিনি সম্মুখস্থ সকল পদার্থই মনোহর কবিত্বে বিভাষিত করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার গীতিগুলি অতিশয় সহজ ও কোমল; তাহা সকলেরই প্রীতিপ্রদ ও মনোহর। কিন্তু রামপ্রসাদের গীতগুলি যে প্রকার উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারে, তাঁহার রচিত অন্যান্য গ্রন্থগুলি কবি সমাজে সে স্থান লাভ করিতে পারে না। কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দরের পর, ভারতচন্দ্র গ্রন্থ রচনা না করিলে, তিনি এ বিষয়ে মান্য পাইতে পারিতেন; কিন্তু ভারতচন্দ্র তাঁহার পর বিদ্যাসুন্দরের চিত্র অঙ্কিত করিয়া, তাঁহার সুন্দরকে নিষ্প্রভ করিয়া ফেলিয়াছেন; তবে যে কবিরঞ্জন ইহাতে কিছুই কবিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই তাহা নহে; রামপ্রসাদও স্থানে স্থানে বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। ইহার রচিত অন্যান্য গ্রন্থগুলিও এই প্রকার; এই সকলেরই স্থানে স্থানে প্রচুর কবিত্ব শক্তির পরিচয় আছে। তবে রামপ্রসাদের রচনার একটী মহৎ দোষ এই, তিনি অতিশয় অনুপ্রাস প্রিয় ছিলেন; এই অনুপ্রাসের অনুরোধে স্থানে স্থানে তাঁহাকে এমন শব্দ সকল বিন্যাস করিতে হইয়াছে যে, সেগুলি পাঠ করিতেও কষ্ট বোধ হয়; আবার তাঁহার রচনার প্রধান গুণ

এই যে,ভারতচন্দ্র যেমন কখনও হিন্দী—কখনও সংস্কৃত—কখনও পারসী—কখনও বা উর্দ্দূ ইত্যাদি নানা ভাষা মিশ্রিত বাঙ্গালা ব্যবহার করিয়াছেন, রামপ্রসাদ তাহা কখন করেন নাই। তিনি বোধ হয় নানা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন না, কেবল সংস্কৃত জানিতেন, তাহাতেই তাঁহার গ্রন্থে কোন প্রকার বৈদেশিক ভাব প্রবেশ করিতে পারে নাই। তাঁহার সমুদায়ই তাঁহার স্বদেশীয় ও তাঁহার নিজের সম্পত্তি; তিনি ধার করা বুলি বা ভাব ব্যবহার করেন নাই; তিনি আপনার সম্পত্তিতেই আপনার মাতৃভাষাকে বিভাষিত করিয়া গিয়াছেন। এই সমাজে আরও দুই একজন কবি বর্ত্তমান ছিলেন; প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী এই সময়েই কালিকা মঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর প্রণয়ন করেন; ইহার উপাখ্যান ভাগ প্রায় ভারতের সুন্দরের সমান, কিন্তু প্রাণরাম ইহাতে ভারতচন্দ্রের ন্যায় কবিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী এই সময়েই সংরচিত হয়; দুর্গাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ইহার প্রণেতা।

ভারতচন্দ্রের অব্যবহিত পরেই বঙ্গদেশে এক ভয়ানক রাজবিপ্লব উপস্থিত হয়; এই সময়েই সার্দ্ধ পঞ্চশত বৎসর পরে, বঙ্গীয় রাজলক্ষ্মী নিতান্ত নিগৃহীতা হইয়া মুসলমান অঙ্ক পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই রাষ্ট্রবিপ্লবের কারণ অবধারণ করাও দুষ্কর নহে; যে যে কারণবশতঃ সপ্তদশজন মাত্র অনুচর লইয়া, বক্তিয়ার খিলিজী ইহার সার্দ্ধ পঞ্চশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গরাজ্য করতলস্থ করিতে পারিয়াছিলেন, এক্ষণেও ঠিক সেই সেই কারণ গুলিই বিদ্যমান ছিল; তাহার উপর আর একটি কারণ যুক্ত হইয়াছিল। গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাসুন্দর এক প্রকৃতির গ্রন্থ; গীতগোবিন্দ আলস্য

নিশ্চেষ্টতা ও গৃহসুখ নিরতির ফল; যখন সমাজ অতিশয় স্থবির, ইন্দ্রিয়পর ও অলস হইয়া পড়িয়াছে—যখন ইন্দ্রিয় লালসা চরিতার্থ করাই জীবের একমাত্র কার্য্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে—গীতগোবিন্দ সেই সময়ে প্রণীত হয়। সমাজ তখন নিশ্চেষ্ট—গতিহীন—ক্রিয়াহীন; সমাজের এইরূপ হীনাবস্থা জন্যই বক্তিয়ার খিলিজীর আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াই আজন্ম রাজা লাক্ষ্মণেয় উত্তোলিত ভোজনগ্রাস ভোজন পাত্রে নিক্ষিপ্ত করিয়া, অন্তঃপুর দ্বার দিয়া নৌকা যোগে প্রস্থান করিলেন; বিনা রুধির পাতে—বিনা বাক্যব্যয়ে বঙ্গরাজ-সিংহাসন তাঁহার আয়ত্তাধীন হইল; এমন হীন রাজপরিবর্ত্তন অন্য কোন জাতির, কোন ইতিহাসে পরিলক্ষিত হয় না; শত্রুর আগমন সংবাদ মাত্রেই কোন রাজা অন্তঃপুরের দ্বার দিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করেন নাই। ইহা কেবল নিশ্চেষ্ট—অলস সমাজের ফল; এই আলস্য—ইন্দ্রিয় পরতা ও নিশ্চেষ্টতা জন্যই আজন্ম রাজার, অশীতি বৎসর রাজত্ব করিয়াও রাজ্যের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র মমতা হইল না। তাহার পর এই পাঁচশত বৎসর পরেও বঙ্গীয় সমাজ পুনরায় সেই অবস্থায় উপনীত হইয়াছে; আবার সমাজে সেই নিশ্চেষ্টভাব—সেই ইন্দ্রিয় পরায়ণতা—সেই আলস্য প্রবেশলাভ করিয়াছে. সেই নিশ্চেষ্ট সমাজের ফল বিদ্যাসুন্দর। এক্ষণে কেবল হিন্দু নহে—মুসলমান সমাজ পর্য্যন্ত সেই দশা-গ্রস্থ হইয়াছে; সুতরাং রাজ্য পরিবর্ত্তন অলঙ্ঘনীয়। তাহার উপর আর একটি বিশেষ কারণ এই যে, বঙ্গীয় পূর্ব্বতন নবাবগণ ইংরাজের বল বিক্রম বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন—তাঁহারা যে কেবল বাণিজ্য বিস্তার জন্যই এদেশে আগমন করেন নাই

তাহা ও বুঝিতে পারিয়াছিলেন; সেই জন্য পাছে কোন গৃহ বিবাদ সর্ব্বনাশের মূল হয়, এই কারণে তাঁহারা হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিয়াছিলেন; সুজাউদ্দীন—আলিবর্দ্দী, হিন্দু-মুসলমানকে সমান চক্ষে দর্শন করিতেন; সুতরাং তাঁহাদের সময়ে বিপ্লবের তত আশঙ্কা ছিল না; কিন্তু এক্ষণে সিরাজুদ্দৌলা বঙ্গের সিংহাসনে আসীন; তিনি হিন্দু মুসলমান সকলকেই সমান পীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন—সুতরাং সকলেই এই ক্রূরকর্ম্মার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সচেষ্টিত হইলেন; এ দিকে পূর্ব্ব হইতেই লোকে ইংরাজ বণিকবৃন্দের অসীম ক্ষমতা সন্দর্শনে তাঁহাদের বশীভূত হইয়াছিলেন; এক্ষণে সকলেই নবাবের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। ইংরাজ বণিক নবাবের সহিত যুদ্ধ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে ছিলেন; এক্ষণে এই উপযুক্ত সময় বুঝিয়া তাঁহারা রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তি ও রাজ কর্ম্মচারীর সহিত নবাবের ভেদ সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি প্রধান ব্যক্তিবৃন্দ ও মীরজাফর প্রভৃতি রাজ কর্ম্মচারীগণ ক্রমে ইংরাজের বশীভূত হইলেন; সুতরাং মুসলমান রাজ্যের আর ভরসা কোথায়? আবার এমন সময়ে সুচতুর ক্লাইব ইংরাজ সেনা নায়ক। এক্ষণে ইংরাজ বণিক নবাবের সহিত যুদ্ধের ছল অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; দুর্ব্বৃত্ত রাজবল্লভ ও তৎপুত্র কৃষ্ণদাস হইতে তাহা সংসাধিত হইল; তবে আর যুদ্ধের বিলম্ব কি? ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন পলাসী ক্ষেত্রে উভয় পক্ষীয় সৈন্যবৃন্দ যুদ্ধার্থ উপস্থিত; যুদ্ধ আরম্ভ হইল; নবাবের প্রধান সেনাপতি দুর্ব্বৃত্ত মীরজাফর আপন সৈন্য

সমেত চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রের পার্শ্বে দণ্ডায়মান; তাঁহার আশা ইংরাজবণিক ক্ষেত্র লাভ করিলেই তিনি বঙ্গের সিংহাসনে সমাসীন হইবেন; রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিগণের আশা তাঁহারা কোনরূপে নবাবের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলে ইংরাজকে দূরীভূত করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবেন; তাঁহারা মনেও ভাবেন নাই যে, দাসত্বের পরিবর্ত্তে চির দাসত্ব শৃঙ্খল গলায় পরিতেছেন; যাহা হউক, নানা প্রকার কৌশলে ইংরাজ বণিক ক্ষেত্র লাভ করিলেন; সেই অবধি ইংরাজ আর বণিক নহে; তাঁহারা দেশের রাজা হইয়া বসিলেন; সকলের আশা ভরসা সমূলে নির্ম্মূল হইল; ক্রমে ক্রমে সমুদায় ভারত ইংরাজের পদানত হইল; এই ভয়ঙ্কর রাজবিপ্লবে সমুদায় বঙ্গ বিপ্লুত হইল। কোন বিপ্লবের পরে রাজ্যে যে সকল অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে বঙ্গদেশ তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইল না; ইহার সকল স্থলেই দুর্ব্বলের উপর দুর্ব্বৃত্তের অত্যাচার প্রবল হইল—দেশময় অরাজকতা স্থান পাইল; দিনে বলবানের অত্যাচার,—রাত্রিকালে দস্যুগণের অত্যাচার; এইরূপ অত্যাচারে বঙ্গদেশ প্লাবিত হইল; এই অত্যাচার নিবারণ করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন করিতে ইংরাজের অনেক দিন লাগিয়াছিল; কিন্তু সম্যক শান্তি স্থাপিত না হইতে হইতেই বঙ্গদেশ এক ভয়ানক নৈসর্গিক অত্যাচারে প্রপীড়িত হইল; ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম বঙ্গে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ভয়ঙ্কর মন্বন্তর উপস্থিত হইল। লক্ষ লক্ষ প্রাণী অনাহারে প্রাণত্যাগ করিল—আর কত স্থানে লুণ্ঠন, হত্যা প্রভৃতি ভীষণ অভিনয় হইতে লাগিল তাহার গণনা কে করিতে পারে? এই দুর্ভিক্ষে বঙ্গদেশের এত লোক নষ্ট

হইয়াছিল যে, মৃত দেহ স্পর্শ না করিয়া এক পদ অগ্রসর হইবার ক্ষমতা ছিল না—এবং বঙ্গদেশ এক্ষণেও সম্যকরূপে সেই ক্ষতির পূরণ করিয়া উঠিতে পারে নাই; ইংরাজরাজই এই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের কারণ; তাঁহারা ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে অজন্মা হইলেও আপনাদের রাজস্ব কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করিতে ক্রটি করেন নাই; লোকের যাহা কিছু সঞ্চিত অর্থ বা খাদ্য ছিল, তৎসমুদায়ই রাজস্বের দায়ে তাঁহাদিগকে দিতে হইয়াছিল; অবশেষে সকলে উদর জ্বালায় আগামী বৎসরের জন্য সঞ্চিত শস্য বীজ পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন; তাহার উপর সে বৎসরও অনাবৃষ্টি; সুতরাং আর উপায় কি? উদর জ্বালায় সকলে ব্যতিব্যস্ত হইল—সকলে দলে দলে রাজধানী অভিমুখে ছুটিতে লাগিল; বিষ্ণুপুরাধিপতি এই দুর্ভিক্ষে অন্নদান করিয়াই নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন; এই দুর্ভিক্ষোপলক্ষে তিনি যত টাকা কর্জ্জ করিলেন তাহা আর কিছুতেই পরিশোধ করিতে পারিলেন না; সুতরাং তাঁহার রাজ্য বিক্রীত হইল। পশ্চিম বঙ্গ হইতে দলে দলে লোক কলিকাতাভিমুখে ছুটিতে লাগিল; ইংরাজ রাজ সে সংবাদ রাখিলেন না; ক্রমে ক্রমে ইংরাজের বিলাস ভবনের বারাণ্ডার সম্মুখ দিয়া, গঙ্গার উপর সহস্র সহস্র শব ভাসিয়া যাইতে লাগিল; ইংরাজরাজের নিদ্রাভঙ্গ হইল; উঠিয়া দেখিলেন, চতুর্দ্দিকে মৃত দেহ ও প্রজাবৃন্দের হাহাকার ধ্বনি; মুমূর্ষ ব্যক্তির প্রতি ঔষধ প্রয়োগের ন্যায় ইংরাজ দুর্ভিক্ষ দমনে চেষ্টিত হইলেন; তখন ঔষধের সময় অতীত হইয়াছে। যাহা হউক, ইহা প্রশমনের জন্য তাঁহারা কোষাগার হইতে নগদ ৪০০০০ টাকা বাহির করিলেন; টাকা আবার সুপাত্রে ন্যস্ত হইল, সেই সুপাত্র

ইংরাজ কর্ম্মচারী লক্ষ লক্ষ প্রাণী হত্যার পাতক হইয়া, সেই অর্থ অক্লেশে আত্মসাৎ করিলেন (১); ধন্য ইংরাজ! তোমার বদান্যতা—তোমার দয়াশীলতাকে শত সহস্র নমস্কার। যাহা হউক, তদানীন্তন ইংরাজগণের ধন লালসা এতাদৃশ বলবতী ছিল যে, তখন তাঁহারা কোন প্রকার পাপ কার্য্যই অকরণীয় জ্ঞান করেন নাই; যেমন করিয়া হউক অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত।

বঙ্গের এরূপ উপপ্লবের সময় জাতীয় সাহিত্যের বিকাশ অসম্ভব; যৎকালে সকলেই উদরান্নের জন্য লালায়িত—দস্যু-

---

(১) "They believed the guilt lay at the door of their own countrymen high in office, and called for disclosure of their names; but the names were never audibly disclosed. One who held an important place at the time, returned to his own country, a wealthy man, founded a family since ennobled, and amid "honour, love, obediance, troops of friends," lay down to spend the evening of his days in peace. But the best of blessings was denied him. His nights were haunted by images and sounds which would not let him sleep; and though a man of what is called iron frame and of ready courage, to his dying hour he never would allow the lights to be extinguished round his bed".

W. M. Torrens' "Empire in Asia". Page 77.

গণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত সচেষ্টিত, তখন কবিতা দেবীর আরাধনা কোথা হইতে হইবে; সুতরাং এ সময়ে আমরা কোন উৎকৃষ্ট কবি দেখিতে পাই না। বঙ্গদেশ কথঞ্চিৎ অরাজকতা ও ভীষণ দুর্ভিক্ষ রাক্ষসীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলে আমরা নির্ব্বাপিত দীপের অগ্নিমুখী বর্ত্তিকা সদৃশ একটি কবির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকি; ইহার নাম নিধিরাম গুপ্ত। এই সময়ে বঙ্গদেশে এক প্রকার কবি উদিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সাধারণতঃ কবিওয়ালা বলিয়া প্রসিদ্ধ। নিধিরাম গুপ্তও কতকটা সেই প্রকার ছিলেন; তবে কতিপয় গীত রচনা করিয়া তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন; তাঁহার রচিত গীতগুলি সাধারণতঃ "নিধুবাবুর টপ্পা" বলিয়া অভিহিত, এবং ইহার অধিকাংশ গীতই অশ্লীলতা দুষ্ট; তবে মধ্যে মধ্যে দুই একটী গীতে উচ্চতর প্রেমেরও আদর্শ আছে; এবং সেগুলি বেশ প্রীতিকর ও মনোহর। নিধুবাবুর রচনা বেশ সুললিত ও মার্জ্জিত; আমরা এই স্থলে তাঁহার প্রণীত একটী গীত উদ্ধৃত করিলাম;—

দুঃখ দিবে বলে কি প্রেম ত্যজিব।
দুঃখে সুখ জ্ঞান করি যতনে তায় তুষিব॥
না থাকে তাহার মন, করিবে না আলাপন,
তবু সে বিধুবদন,
দূরে থেকে দেখিব।

এই রূপ তাঁহার গীতের স্থানে স্থানে বেশ কবিত্ব শক্তির বিকাশ আছে; তবে অধিকাংশই আদিরস গ্রথিত। নিধু বাবুর প্রণীত গীতগুলি পুস্তকাকারে "গীতরত্ন" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে; কিন্তু সে গুলি রত্ন না হইলেও অল্প মূল্যবান

নহে; তাহাদিগকে রক্তের সহিত অক্লেশে মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। রাজ পরিবর্ত্তনের পর তিনিই প্রথম কবি; নিধিরাম সেই দুঃসময়ে যে কথাটি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন তাহা শতবৎসর পরে বঙ্গদেশে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে—তিনি সেই সময়ে যে মহান উপদেশ দিয়া গিয়াছেন এতদিন পরে তাহার ফল ফলিতেছে; তিনি বলিয়াছিলেন;—

নানান্ দেশে নানান্ ভাষা।
বিনা স্বদেশীয় ভাষা পূরে কি আশা॥

এই উপদেশ বাক্যটির গভীর অর্থ এক্ষণে সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। পৃথিবীর মধ্যে বাঙ্গালী অধম জাতি; তাহার গরীমা করিবার কিছুই নাই—বাঙ্গালী আত্মগৌরব করিতে পারেন এমন কোন কার্য্য কখন করেন নাই; তাঁহাদের জীবনে আলোক মাত্র নাই; সর্ব্বত্রই নিরাশা—সর্ব্বত্রই অন্ধকার; বাঙ্গালী প্রতিপদ বিক্ষেপেই নিরাশা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না; এক্ষণে সেই ঘোর নৈরাশ্যের মধ্যে অতিদূরে একটি ক্ষীণালোক স্তিমিতভাবে জ্বলিতেছে; বাঙ্গালী কোন কার্য্যের জন্যই জগৎ সমক্ষে দাঁড়াইতে পারেন না; কেবল একটির জন্য তাঁহারা গৌরব করিতে পারেন; সেটি নিধিরাম গুপ্তের মহান উপদেশ বাক্যের ফল। বাঙ্গালী জগৎ সমক্ষে সদর্পে বলিতে পারেন, এই দেখ পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের ভাষা কি ছিল অদ্য কি হইয়াছে; পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে যে ভাষায় প্রেমের মধুর গীতি বা অত্যাচারের মর্ম্মভেদী উচ্ছ্বাস ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ হইত না; এক্ষণে তাহাতে মিল—ডার্ব্বিনের তত্ত্ব সকল সমালোচিত হইতেছে; বিস্‌মার্ক—গ্ল্যাডষ্টোনের কূট-তর্ক-বিতর্কের সমালোচনা হই-

য়েছে; ম্যাটসিনী—নেপোলিয়নের জীবনী অনুবাদিত হই-য়েছে; এক্ষণে সে ভাষা আর শুধু প্রেমের ভাষা নহে—ইহাতে প্রিয় ভাব ও ভীম ভাব সমুদায়ই ব্যক্ত করা যায়। বাঙ্গালী যদি কিছু গৌরব করিতে পারেন তবে তাহা এই ভাষার জন্য; তিনি এই সামান্য দিনের মধ্যেই ভাষার যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন, এরূপ পৃথিবীর অন্য কোন জাতিই কখন সম্পাদন করিতে সমর্থ হন নাই; সুতরাং তাঁহার ভবি-ষ্যৎ নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারময় নহে। যে বাঙ্গালী এত অল্প-দিনের মধ্যে ভাষা সম্বন্ধে এতাদৃশ যুগান্তর উপস্থিত করিয়া-ছেন, তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় কোন কার্য্যই অসাধ্য নহে। তাঁহারা সকল কার্য্যেই সমান প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন। তবে স্বাধীন চিন্তা বহুকাল হইতেই বাঙ্গালীর নিকট হইতে প্রস্থান করিয়াছে, তাহা প্রাপ্ত হইতে এখনও বহু বিলম্ব; যাহা হউক তাঁহাদের ভবিষ্যৎ আর নিরবচ্ছিন্ন কুহেলিকাপূর্ণ নহে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে ইংরাজ রাজ্যারম্ভের সময়েই কবি-ওয়ালাগণ সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। নিধিরাম গুপ্ত নিজে একজন কবিওয়ালা ছিলেন; কিন্তু তাঁহার কবি ব্যবসায় ছিল না; তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়াকোম্পানীর কোন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু অপর কতকগুলি লোকের ইহা ব্যবসায় ছিল; এই দলের মধ্যে হরুঠাকুর ও রাম রাম বসু প্রভৃতি প্রধান। এই সময়ের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ ইহাদের উৎসাহ দাতা ছিলেন; তাঁহাদের উৎসাহেই ইহাদের দল পরিপুষ্ট হয়; যাহা হউক, এই কবিওয়ালাদের মধ্যে দুই একজন অতি উচ্চ দরের কবি ছিলেন; তাঁহাদের রচনা যেমন সুন্দর, তেমনিই

প্রীতিকর; তাঁহাদের কবিতা যেন স্বভাবের হস্ত হইতে বিনির্গত হইয়াছে, যেমন মধুর—তেমনই মনোহর। কবিওয়ালাগণের মধ্যে হরুঠাকুরই সর্ব্ব প্রধান; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার রচিত প্রায় সমুদায় গীতই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। রামরাম বসুর বিরহ অতিশয় বিখ্যাত; তাঁহার আগমনী ও সখি সংবাদও নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ নহে; তিনি দুই একটি গীতে এরূপ অসাধারণ কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন যে, তাহা পাঠ করিলে আহ্লাদে সর্ব্বশরীর পুলকিত হইয়া উঠে। তিনি অন্তর ও বাহ্য জগদ্বর্ণনায় অসামান্য নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন; ইঁহার রচনায় কষ্ট কল্পনার লেশ মাত্র নাই—সকলই সরল—সকলই সুন্দর—সকলই মনোহর; আমরা এই স্থানে তাঁহার একটী গীত উদ্ধৃত করিলাম;—

মহড়া।

মনে রৈল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে, যখন যায় গো সে, তারে বলি বলি বলা হলো না॥
সরমে মরম কথা কওয়া গেলনা॥
যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে,
নিলজ্জা রমনী বলি হাসিত সব লোকে,
সখি ধিক্ থাক আমারে, ধিক্ সে বিধাতারে,
নারীজনম যেন করেনা॥

চিতেন।

একে আমার এ যৌবন কাল, তাহে কাল বসন্ত এল,
এ সময় প্রাণনাথ প্রবাসে গেল।
যখন হাসি হাসি সে আসি বলে,
সে হাসি দেখে ভাসি নয়নের জলে,

তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, মন চায় ধরিতে,
লজ্জা বলে ছিছি ধরোনা॥

অন্তরা।

তার মুখ দেখে, মুখ ঢেকে, কাঁদিলাম স্বজনি;
অনায়াসে, প্রবাসে, গেল সে গুণমণি;
এ কি সখি! হলো বিপরীত, রেখে লজ্জার সম্মান,
মদন দহিছে এখন এ অবলার প্রাণ;
যদি সে হলো নিদয়, লইল বিদায়,
তবে যেন সখি প্রাণও রহে না॥

আমরা উপরে যে গীতটি উদ্ধৃত করিলাম তাহা রাম বসুর বিরহ বর্ণনা হইতে; এক্ষণে আগমনী হইতে একটি পদ উদ্ধৃত করিলাম;—

ফিরে এলে গিরি, কৈলাসে গিয়া,
তত্ত্ব না পেয়ে যার।
তোমার সেই উমা এই এল, যাতনা ঘুচিল,
সঙ্গে শিব পরিবার॥
এখন গঞ্জনা এড়ালে, ওহে গিরিরাজ,
সব দুঃখ দূরে গেল।
আমার মা কৈ মা কৈ, বলে উমা ঐ,
ব্যগ্র হয়ে দাঁড়াইল॥
হোক হোক হোক, উমা সুখে রোক
সদাই হ'তেছে মনে।
ভিখারীর ভাগ্যে, পড়েছেন দুর্গে,
তাঁর ভাগ্যে হেন হবে কে জানে॥

দুহিতার সুখ, শুনিলে হে গিরি,
যে সুখ হয় আমার।
আছে কন্যা যার, সেই শুধু জানে,
অন্যে কি জানিবে তার॥
যদি কেহ বলে, ওগো উমার মা,
উমা ভাল আছে তোর।
যেন করে স্বর্গ পাই, অমনি ধাইয়া যাই,
আনন্দে হ'য়ে বিভোর॥

আর অধিক উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই; যাহা হইল তাহাতেই কবির ক্ষমতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। রাম বসু রচনায় যেরূপ পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন—ভাব পারিপাট্যে ততদূর কৃতকার্য্য হন নাই; তাঁহার রচনা যেরূপ সুচিক্কণ ও মনোমুগ্ধকর—ভাবের তাদৃশ মনোহারিত্ব নাই; ভাব মাধুর্য্য অপেক্ষা তাঁহার রচনা চাতুর্য্য অতি পরিপাটি। তাঁহার কল্পিত প্রেম, প্রেমের উচ্চ আদর্শ নহে—তাহা ইন্দ্রিয়পর লোকের কলুষিত প্রেম; তাহাতে গভীরতা নাই—কেবল পঙ্কিলতা আছে; তাহাতে আত্ম বিস্মৃতি—আত্ম বিসর্জ্জন নাই;—সর্ব্ব স্থলেই আত্ম সুখ পরায়ণতা ও ভোগ নিরতি আছে। ইহার প্রেম আত্মোৎসর্গ করিয়া— আপনাকে দুঃখের বিকট গ্রাসে ফেলিয়া—পরকে সুখী করিতে পারে না; ইহা আপনার দুঃখের অংশ পরকে দিয়া সুখী হইতে চাহে; এ প্রেম প্রেমের পবিত্র আদর্শ নহে—ইহা কলুষিত প্রেম; কিন্তু এরূপ প্রেম বর্ণনার জন্য রামবসু দোষী নহেন। যে দোষের জন্ম ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে ভক্তি রসের অবতারণা করিতে গিয়া, অশ্লীলতা-পূর্ণ বিদ্যাসুন্দরের কলুষিত চিত্র আঁকিয়া ফেলিয়া-

ছেন—সেই গুরুতর দোষেই রাম বসু প্রেমের পবিত্র চিত্র দিতে গিয়া এরূপ কলঙ্কিত প্রেমের চিত্র আঁকিয়া বসিলেন; এ দোষ রাম বসুর নহে—এ দোষ তদানীন্তন সমাজের। তদানীন্তন সমাজ কি প্রকার ছিল এক্ষণে তাহাই দেখিতে হইতেছে। সেই সময়ে ইংরাজগণ দেশে কতকটা শান্তি স্থাপন করিয়াছেন—দেশে আর ততটা অরাজকতা নাই—দুর্ভিক্ষ রাক্ষসীর ভয়ানক অত্যাচার তখন কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়াছে; বঙ্গবাসী আর একবার ভোগ সুখে নিরত হইয়াছেন। বাঙ্গালী চিরকাল আত্ম সুখ পরায়ণ ও অনুকরণ প্রিয়; এমন অনুকরণ প্রিয় জাতি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই; তাই মুসলমানগণের কঠোর রাজত্ব কালে তাঁহাদের অনেক বিষয় অনুকরণ করিয়াছিলেন; মুসলমান প্রজার ন্যায় তাঁহারাও "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" বলিতেন; আত্ম সুখ বিধানের জন্যই চির-জাতি-প্রথা-প্রিয় ভারতবাসী কুল শীলের মায়া পরিত্যাগ করিয়া—লাঞ্ছনা—গঞ্জনা তৃণ জ্ঞান করিয়া আপনাপন কন্যা, ভগ্নীকে যবনের উপভোগ্যা করিয়া দিয়াছিলেন; মুসলমানের ন্যায় বাঙ্গালীগণও বেশ্যাসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাঁহাদের আপন স্ত্রী দাসী মধ্যে গণ্য হইয়াছিল। তখন পরকীয়া প্রেমই যথার্থ প্রেমিকের মান্য পাইত, আর স্বকীয়া প্রেম স্ত্রৈণ পদ বাচ্য হইত। আবার ইংরাজ দেশের রাজা; তাঁহারা সে কালে এক্ষণকার ন্যায় স্বদেশ হইতে আপনাপন স্ত্রী-কন্যা আনিতেন না; সুতরাং তাঁহারা কেবল পাশবোপায় দ্বারা তাঁহাদের পাশব লালসা চরিতার্থ করিতেন—আবার এই জন্য সময়ে সময়ে তাঁহারা পৈশাচিক বৃত্তি অবলম্বন করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। চির অনুকরণ প্রিয় বঙ্গবাসী এই সকল

হইতে কেন না পরকীয়া প্রেম শিক্ষা করিবেন? তাই সে সময়ে পরকীয়া প্রেমেরই আদর; তখন যিনি যত অধিক সংখ্যক গণিকা রাখিতে পারিতেন, তিনিই তত উচ্চ প্রেমিক বলিয়া অভিহিত হইতেন। সমাজের এইরূপ অবস্থায় রাম বসুর জন্ম; সুতরাং তিনিও সমাজের প্রবণতা অনুসারে গীত গাহিলেন—তাহাতে তাঁহার দোষ কি? কোন লেখকের রুচির জন্য তদানীন্তন সমাজ যতটা দায়ী—লেখক ততটা নহেন; সুতরাং রামবসুর রচনায় যে, প্রেমের গভীরতা দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা তাঁহার দোষে নহে—সমাজের দোষে; তথাপি রামবসু একজন উচ্চদরের কবি ছিলেন বলিয়াই, তাঁহার রচিত দুই একটি গীতে উচ্চ প্রেমেরও আদর্শ আছে। ইঁহার কবিতা যেন স্বভাবের মুক্তহস্ত হইতে আপনা হইতেই বহির্গত হইয়াছে; তাহাতে কোন প্রকার কষ্ট-কল্পনা নাই—সকলগুলিই সরল ও সুন্দর। তাঁহার গীতের স্থানে স্থানে অতি উচ্চ দরের ভাব অভিব্যক্তি আছে; প্রেম বর্ণনা ছাড়িয়া তাঁহার রচিত অন্যান্য গীতি দেখিলে এ কথা নিঃসন্দেহ রূপে প্রতীয়মান হয়; আমরা তাঁহার আগমনী হইতে যে গীতটি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার ভাব অতি মহান্—এমন স্নেহপূর্ণ গভীর ভাব বিশিষ্ট রচনা দুর্লভ। যাহা হউক, রামবসু একজন উচ্চদরের কবি ছিলেন তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কবিওয়ালাগণ দেশ হইতে এক্ষণে প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছেন; কিন্তু ইংরাজ রাজত্বের প্রথমাবস্থায় ইহাদের সাতিশয় প্রাদুর্ভাব ছিল; এই সময়ে আমরা অনেক কবিওয়ালার দর্শন লাভ করিয়া থাকি। তাঁহাদের মধ্যে হরুঠাকুর ও রামবসুই প্রধান; তাঁহাদের নিম্নে নিলুরামপ্রসাদ, রামনৃসিংহ, নিতাই বৈষ্ণব, লালুনন্দ

লাল, কৃষ্ণ-মুচি, নীলমণি পাটুনী, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য, সাতুরায় প্রভৃতি কবিওয়ালাগণ। এই সময়ে ইঁহাদের এতই প্রাহুর্ভাব হইয়াছিল যে, ছুই এক জন ইয়ুরোপীয় পর্য্যন্ত ইহাদের দলপুষ্ট করিয়াছিলেন; কবিওয়ালা আণ্টনী ফিরিঙ্গীর নাম বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন; আণ্টনী সাহেবের রচনা ও নিতান্ত মন্দ নহে; তিনি গাহিয়াছিলেন;—

যদি নিজ গুণে তার মোরে এ ভবে মাতঙ্গী।
আমি ভজন পূজন জানি না মা! জাতিতে ফিরিঙ্গী॥

কবিওয়ালাগণের মধ্যে আমরা কেবল ইহাদেরই নামোল্লেখ করিলাম; তদ্ব্যতীত আরও অনেক কবি ছিলেন তাঁহাদের নাম আর এস্থলে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

কবিওয়ালাগণের পরেই আমরা রাজা রামমোহন রায়ের কালে সমুপস্থিত হইতেছি; রামমোহন রায় ধর্ম্ম সংস্কারক ছিলেন; তাঁহার ধর্ম্ম সংস্কার স্বাধীন ভাবের ফল; রামমোহনের পূর্ব্বেই ইংরাজ রাজ দেশ হইতে অশান্তির কারণ সমুদায় বিনাশ করিয়া লোকের স্বাধীন চিন্তার প্রশ্রয় দিয়াছিলেন; সেই প্রশ্রয় দিবার ফল রাজা রামমোহন। বঙ্গবাসী—চিরকালই অতি বুদ্ধিমান জাতি বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ; একথা অমূলক নহে; তাঁহারা যখনই সুবিধা পাইয়াছেন—যখনই স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে পাইয়াছেন, তখনই নানা বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন; ধর্ম্ম হিন্দুগণের অতি আদরের ধন; সুতরাং স্বাধীন চিন্তায় যে, সেই আদরের ধনের সংস্করণ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? স্বাধীন পাঠানরাজগণের রাজত্ব সময়ে বঙ্গে একটু স্বাধীন ভাব অঙ্কুরিত হইয়াছিল—সেই স্বাধীন ভাবের ফল চৈতন্যদেবের ধর্ম্ম প্রচার—

রঘুনাথ শিরোমণির ন্যায় শাস্ত্র প্রচার—ও স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের স্মৃতি শাস্ত্রের বিস্তার। কিন্তু স্বাধীন পাঠানগণের সময়ে স্বাধীন চিন্তার প্রণোদনে যেমন বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার হইল, অমনি ঠিক সেই সময়ে—সেই রূপেই "অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব" জন্ম গ্রহণ করিল—সুতরাং সেই দিন হইতেই সমান স্বাধীন ভাবেই বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের মূলে কুঠারাঘাত হইবার উপায় হইল। যেরূপ স্বাধীন ভাবে চৈতন্য দেব নব ধর্ম্ম বিধান করিলেন—সেইরূপ স্বাধীন ভাবেই স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য সেই সময়ে তাহার প্রশমনার্থ "অষ্টা-বিংশতি তত্ত্ব" প্রচার করিলেন; সুতরাং পরস্পর সংঘাতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম সমাজে অধিকদিন প্রচরদ্রূপ রহিতে পারিল না। যদি একই সময়ে রঘুনন্দনের তত্ত্ব সকল প্রণীত না হইত, তাহা হইলে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অবস্থা কি প্রকার হইত কে বলিতে পারে। যাহা হউক, যেরূপ স্বাধীন চিন্তাক্ষম সমাজের ফল গৌরাঙ্গ—সেইরূপ স্বাধীন সমাজের ফল রামমোহন। রামমোহনের সময়ে সমাজে পুনরায় স্বাধীন চিন্তার স্রোত প্রসারিত হইয়াছে। এই মহাত্মাই সেই সময়ে সনাতন ধর্ম্মের পৌত্তলিকতা বিনষ্ট করিয়া যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা একেশ্বর বাদ সংস্থাপন করিতে সচেষ্ট হইলেন; এই জন্য তিনি কলিকাতা মহানগরীতে একটি সভা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দু-সমাজ হইতে তিনি প্রথমে অতিশয় বাধা প্রাপ্ত হন। যাহা হউক, এই বিরুদ্ধ মতদ্বয়ের সংঘর্ষে এই সময়ে বাঙ্গালা ভাষার যথার্থ শ্রীবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়। শুধু তাহাই নহে; এই সময়ে সামাজিক অত্যাচার সকল নিবারণ করি-বার জন্য রামমোহন সৎযুক্তি মূলক বহুল গ্রন্থ রচনা করেন,

আবার হিন্দু-সমাজ হইতে সেই সকল মতের খণ্ডন স্বরূপ নানাবিধ পুস্তক প্রণীত হয়; সুতরাং এই খণ্ডন প্রতি খণ্ডনে বাঙ্গালা ভাষার যথার্থ উন্নতি হইতে আরম্ভ হয়; এই ঘাত প্রতিঘাতে বাঙ্গালা ভাষা যেরূপ আলোড়িত ও বলপ্রাপ্ত হইয়াছিল, এতদিন পরে আমরা তাহার ফলভোগ করিতেছি। এই সময়ে যে সকল গ্রন্থ রচিত হয়, প্রায় তৎসকল গুলিই গদ্য, সুতরাং গদ্য রচনা এই সময় হইতেই সুপরিষ্কৃত ও সুমার্জ্জিত হইতে আরম্ভ হয়।

অনেকে বলেন রামমোহনই বাঙ্গালা ভাষার প্রথম গদ্য লেখক; কিন্তু তাহা যথার্থ নহে। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে সময়ে বাঙ্গালা পদ্যের উৎপত্তি, ঠিক সেই সময়েই বাঙ্গালা গদ্যের জন্মলাভ; বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস যেরূপ প্রথম বাঙ্গালা কবিতা লেখক—তাঁহারা সেইরূপই ইহার আদি গদ্য লেখক; তৎপরবর্ত্তী শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী প্রভৃতি চৈতন্যসহচরগণ পদ্যেরন্যায় গদ্যেও অনেক গ্রন্থ রচনা করেন; তাঁহাদের পর কথক সম্প্রদায় ইহার অনেক অঙ্গ-সৌষ্ঠব সাধন করেন; কথক সম্প্রদায়ের অনেক পূর্ব্বেই গদ্যে ত্রিপুরার রাজমালা রচিত হইতে আরম্ভ হয়; আবার প্রতাপাদিত্য চরিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্র, রাজাবলী, প্রবোধ চন্দ্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থ রামমোহনের পূর্ব্বেই বিরচিত হয়; হরনাথ রায় তাঁহার পূর্ব্বেই সংস্কৃত পুরুষ পরীক্ষার বাঙ্গালা গদ্যে অনুবাদ করেন; কিন্তু এতগুলি গ্রন্থ তাঁহার পূর্ব্বে রচিত হই-লেও আমরা তাঁহাকেই আদি গদ্য লেখক বলিতে অসন্তুষ্ট নহি; কেন না তাঁহার পূর্ব্ব সাময়িক গদ্য গ্রন্থ সকল এতাদৃশ জঘন্য ভাষায় লিখিত যে, রামমোহনকেই ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা

বলিলে নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না। তিনি সরল ভাষায় লিখিত উপর্য্যুপরি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এই সময়ে এদেশের শাসন কর্ত্তা ছিলেন; তাঁহার সময়ে সহমরণ প্রথা লইয়া হিন্দু-সমাজে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়; বেণ্টিঙ্ক সতীদাহ উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত প্রয়াসী—হিন্দু-সমাজ তাঁহার বিরোধী; এমন সময়ে রাজা রামমোহন তাঁহার সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার অনেক পূর্ব্বে লর্ড ওয়েলেসলী একবার সতীদাহ উঠাইবার নিমিত্ত সচেষ্টিত হইয়াছিলেন—কিন্তু তিনি হিন্দু-সমাজের এবম্বিধ অসন্তোষ দর্শনে তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই; বিশেষতঃ রাজ্য বৃদ্ধি করিতেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইয়াছিল; এক্ষণে বেণ্টিঙ্ক, রামমোহন ও তাঁহার দলের সহায়তা প্রাপ্ত হইলেন। রামমোহন এই সময়ে স্বযুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা সতীদাহ নিবারণ করিবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন; এই সংঘর্ষে বাঙ্গালা সাহিত্য বিশেষ বল প্রাপ্ত হইল। যদিও তদানীন্তন বাঙ্গালা ভাষা এক্ষণকার ন্যায় সুপরিস্কৃত ও সুমার্জ্জিত হয় নাই, তত্রাপি তাহা যে অনেক পরিমাণে চিক্কণ হইয়া আসিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রামমোহন রায় যে কেবল গদ্য রচনাই করিয়াছিলেন তাহা নহে; তাঁহার প্রণীত অনেকগুলি গীত আছে; সে গুলি অতীব প্রীতিপ্রদ ও মনোহর। রামমোহন বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্মের সংস্থাপয়িতা; সুতরাং তাঁহার গীতগুলিও সেই ধর্ম্মের পোষক স্বরূপ তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিই হিন্দু-শাস্ত্রানুযায়ী মায়াময় জগতের অনিত্যতা প্রতিপাদক বলিয়া হিন্দুগণেরও চিত্তাকর্ষণ

করিয়াছিল এবং এক্ষণেও তাহা হিন্দুগণের আদরের ধন। যাহা হউক,আমরা রাজা রামমোহন রায়কে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান নির্ম্মাতা বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহি।

রাজা রামমোহনের পরে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রাদুর্ভূত হন; কবিতা রচনায় ইঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল; কিন্তু তিনি ততদূর পণ্ডিত ছিলেন না। তখনকার লোকের রুচি তখনও কিয়দংশে অশ্লীলতার দিকে ছিল; সুতরাং তাঁহার অনেক কবিতা অশ্লীলতা দুষ্ট। বিশেষতঃ তাঁহার সম্পাদিত প্রভাকরের সহিত যখন গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত রসরাজের রসালাপ হইত, তখন পরস্পরের গালি বর্ষণ এত কদর্য্য যে, তাহা গোপনে পাঠ করিতেও লজ্জা বোধ হয়। যাহা হউক, ঈশ্বরচন্দ্রের যথার্থ কবিত্ব শক্তি ছিল বলিয়া তাঁহার কতিপয় রচনা এতই মধুর যে, তাহা পাঠ করিলে মন-প্রাণ সুশীতল হয়; সে গুলি যেমন মসৃণ, তেমনই সুন্দর ভাবে পরিপূর্ণ। তাঁহার কতকগুলি কবিতা যেন স্বভাবের হস্ত হইতে বহির্গত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার কবিত্বে যে প্রকার ক্ষমতা ছিল,পাণ্ডিত্যে সে প্রকার থাকিলে তাঁহার রচনা অতীব প্রীতিকর হইত। যাহা হউক, তিনি হাস্যরসের প্রবর্ত্তনায় অদ্বিতীয় ছিলেন; হাস্যরসে তাঁহার মত কৃতীলেখক আর দেখিতে পাই না। যাহা হউক, ঈশ্বরচন্দ্র অন্য বিষয়ে বিশেষ মান্য পাইবার উপযুক্ত; এক্ষণকার প্রধান প্রধান বঙ্গীয় লেখকগণ প্রায় সকলেই তাঁহার সম্পাদিত পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিয়া রচনা অভ্যাস করেন; ইঁহারা তাঁহার উৎসাহে দ্বিগুণতর উৎসাহিত হইতেন সন্দেহ নাই। দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শ্রদ্ধেয় আধুনিক

লেখকগণ প্রায় সকলেই তাঁহার সম্পাদিত প্রভাকরে প্রথম রচনা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কৃতী লেখকগণ পঠদ্দশা হইতেই প্রভাকরে কবিতাদি প্রকাশ করিতেন; ঈশ্বরচন্দ্র ইঁহাদিগকে বিশেষরূপে উৎসাহিত করিতেন; বলিতে পারি না বাল্যকাল হইতেই ইঁহারা এইরূপে উৎসাহিত না হইলে, ইঁহাদের মাতৃভাষার প্রতি এতাধিক শ্রদ্ধা হইত কি না? বিষবৃক্ষ, আনন্দ মঠ, নবীন তপস্বিনী সেই উৎসাহ বৃক্ষের ফল কি না কে বলিতে পারে? যাহা হউক, ঈশ্বরচন্দ্র স্বতঃ হউক, পরতঃ হউক, বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রভাকরের উদিতোন্মুখী প্রভা সন্দর্শনেই পদ্মিনী প্রস্ফুটিত হয়; পদ্মিনী উপাখ্যানে রঙ্গলাল বাবু যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন—ইহার স্থান বিশেষের রচনা অতীব মধুর ও সুন্দর।

গদ্য রচনার বিষয় দেখিতে গেলে রামমোহনের পরে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পবিত্র নাম আমাদের স্মৃতি পটে অগ্রে সমুদিত হয়; ইঁহার নিকট আধুনিক বাঙ্গালা ভাষা যে পরিমাণে ঋণী, এত অন্য কাহারও নিকট নহে। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত বঙ্গভাষার একজন কৃতী লেখক সন্দেহ নাই; তাঁহার তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত "প্রাচীন হিন্দুগণের বাণিজ্য", "পাণ্ডবগণের অস্ত্র শিক্ষা" বা "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" অতি উৎকৃষ্ট; কিন্তু ইহার উন্নতির মূলেও শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বর্ত্তমান; বিদ্যাসাগর মহাশয়ই অক্ষয়কুমারের প্রথম প্রথম রচনা সংশোধন করিয়া দিতেন। তাহার পর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ,

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, বঙ্কিম বাবু প্রভৃতি কৃতী লেখকগণ এক্ষণে বঙ্গ সাহিত্যাকাশ উজ্জ্বল করিতেছেন, কিন্তু বর্ত্তমান নানা লেখক সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। আমরা কেবল বঙ্গীয় সাহিত্যের উৎপত্তি ও তাহার ক্রমোন্নতি প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছি; সুতরাং এই স্থানে সাহিত্যোন্নতির প্রধান পরিপোষক সম্বাদ বা সাময়িক পত্রিকার উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি দেখিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

বঙ্গভাষায় সর্ব্ব প্রথমে "বেঙ্গল গেজেট" নামে একখানি সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়; গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য ইহার সম্পাদক ছিলেন; এই পত্রখানি ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রচারিত হয়; ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালাভাষায় অন্য কোন পত্রিকা ছিল না; গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য এই কারণে বঙ্গভাষার প্রথম পত্রিকা প্রচারের মান্য পাইতে পারেন; ইহার পরেই সেই বৎসরেই সুবিখ্যাত মিসনরী মার্ষম্যান সাহেব "সমাচার দর্পণ" প্রচার করেন; ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে "দিগ্‌দর্শন" নামে প্রথম সাময়িক পত্র কেরী সাহেব কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়; ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়ে মিলিত হইয়া "কৌমুদী" নামক সংবাদ পত্র, ও শ্রীরামপুরের মিসনরীগণ "গস্‌পেল্ ম্যাগাজিন" প্রকাশ করেন; ১৮২১ খৃষ্টাব্দে রামমোহন "ব্রাহ্মণ সেবধী" বা "ব্রাহ্মণিক ম্যাগাজিন" নামক সাময়িক পত্র প্রচার করেন; এই সময়ে সহমরণ প্রথার আন্দোলনে রামমোহন হিন্দু-সমাজের বিপক্ষতাচরণ করিলে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া নিজে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে "সমাচার চন্দ্রিকা" নামক সংবাদ পত্র প্রথম

প্রচার করেন। এই সময়ে বাঙ্গালাভাষা বিশেষ রূপে সংবর্ষণ প্রাপ্ত হইয়াছিল—এই সময়ে তিনটি ধর্ম্মের আন্দোলনে বাঙ্গালা সাহিত্য বিশেষ পুষ্টি-লাভ করে; একদিকে ভবানীচরণ ও হিন্দুধর্ম্ম, অন্যদিকে রামমোহন ও বেদান্ত, ও অপরদিকে কেরী, মার্সম্যান ও বাইবেল; এই তিন বিভিন্ন মতের সংবর্ষণে ও সহমরণ প্রথার আন্দোলনে বঙ্গভাষা সজীব ও সবল হইয়া উঠিল; ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে নীলরত্ন হালদার কর্ত্তৃক "বঙ্গদূত" প্রকাশিত হয়; অনন্তর ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত "প্রভাকর" প্রচার করেন; ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে রামচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক "জ্ঞানোদয়" নামক সাময়িক পত্রিকা সম্পাদিত হয়; এই সময়ে বঙ্গদেশের আদালত সমূহ হইতে পারসীভাষা অন্তর্হিত হইয়া বাঙ্গালাভাষা তাহার স্থান অধিকার করে; ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাচরণ সেন "বিজ্ঞান সেবধী" নামে আর একখানি সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন; ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে অদ্বৈতচরণ আঢ্যের যত্নে "সংবাদ পূর্ণ চন্দ্রোদয়" প্রথম প্রচারিত হয়; ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য (গুড় গুড়ে ভট্টাচার্য্য) "ভাস্কর" ও "রসরাজ" বাহির করেন; ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে রাজা কৃষ্ণনাথ রায়ের প্রযত্নে "মুর্শিদাবাদ পত্রিকা" জন্ম গ্রহণ করে; ইহাই মফঃস্বলে প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা; ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত "বিদ্যাদর্শন" নামে একখানি সাময়িক পত্র প্রচার করেন; এই সময়ে উপর্য্যুপরি "পথ্য প্রদান" "পাষণ্ড পীড়ন" "আক্কেল গুড়ুম" প্রভৃতি নানাবিধ পত্রিকার ছড়াছড়ি হয়; অনন্তর ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত "তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার" সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করেন; ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে রাজা কালীনাথ চৌধুরীর যত্নে "রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ"

নামে সংবাদ পত্র জন্ম গ্রহণ করে; ইহাই মফঃস্বলের দ্বিতীয় সংবাদ পত্র; তদনন্তর ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি মহাত্মাগণ "সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা" নামে একখানি সাময়িক পত্রিকা প্রচার করেন; ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র "বিবিধার্থ সংগ্রহ" নামক সাময়িক পত্রিকা প্রচার করিতে ব্রতী হন; "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" ও "বিবিধার্থ সংগ্রহ" বাঙ্গালাভাষার যথার্থ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছে; এই দুইখানি পত্রিকাই বিশুদ্ধ প্রণালীতে লিখিত হইত এবং দুইখানিই নিত্য নূতন তত্ত্ব প্রচার ও লোকের ভ্রম দূর করিবার নিমিত্ত ব্রতী ছিল; ইহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রায় যাবতীয় পত্রিকাই কদর্য্য ভাষায় লিখিত হইত, এমন কি তাহাদের মধ্যে কেহই পত্রিকা নামেরই উপযুক্ত ছিল না; এই জন্য "তত্ত্ববোধিনী" ও "বিবিধার্থ সংগ্রহকেই" বাঙ্গালাভাষার প্রথম সাময়িক পত্রিকা ধরিতে হয়। শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি পণ্ডিতগণের সংস্কৃত বহুল সাধুভাষার প্রতি বিরক্ত হইয়া ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বাবু রাধানাথ সিকদার ও বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র "মাসিক পত্রিকা" নামে একখানি অপভাষায় লিখিত মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন; ইহাতেই প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত "আলালের ঘরের দুলাল" প্রথম প্রকাশিত হয়। এই রূপে ক্রমে ক্রমে এতগুলি পত্রিকা জন্ম গ্রহণ করিল সত্য বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত রাজনৈতিক অবস্থা সমালোচন, বা দেশের অভাব বিজ্ঞাপন ও সমাজের ভ্রম প্রমাদ পরিদর্শন করিবার নিমিত্ত একখানি পত্রিকাও জন্ম গ্রহণ করে নাই; তদনন্তর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এই গুরুতর উদ্দেশ্য সাধন করিবার

জন্ত "সোমপ্রকাশ" জন্ম গ্রহণ করে; শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ইহার সম্পাদক; কিন্তু এই পত্রের প্রথম উদ্ভাবক শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর; তিনি কোন নিঃস্ব বালকের জীবনোপায় করিয়া দিবার জন্যই "সোমপ্রকাশের" কল্পনা করেন; পরে কোন কারণ বশতঃ তাহা ঘটিয়া উঠে নাই; তবে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথম প্রথম "সোমপ্রকাশে" প্রবন্ধাদি লিখিতেন। "সোমপ্রকাশ" প্রকাশের পর হইতে বাঙ্গালাভাষায় নানাবিধ উৎকৃষ্টতর সংবাদ ও সাময়িক পত্রিকা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। এ স্থলে তদুল্লেখের আর প্রয়োজন নাই।

যাহা হউক, আমরা বাঙ্গালাভাষার ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া এতদূরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম; ভাষার ক্রমোন্নতি প্রদর্শন করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা দেখাইলামবঙ্গভাষা পূত সলিলা সুরধুনীর ন্যায় প্রথমে অভ্রান্ত হিমাদ্রি সদৃশ সংস্কৃত ভাষা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া হরিদ্বার তীর্থ দৃশ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কল্পনায় আসিয়া প্রবেশ লাভ রিয়াছে; গঙ্গা তথা হইতে নির্গত হইয়া যেমন প্রয়াগ তীর্থে শ্রীকৃষ্ণের রঙ্গ কানন মথুরা ও বৃন্দাবনের পদদেশ বিধৌতকারিণী যমুনার সহিত মিলিতা হইয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষান্তিত্রূপ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের নিকট হইতে আসিয়া গোবিন্দদাস প্রভৃতি অনেক কবি কর্ত্তৃক বর্দ্ধিতায়তন হইয়াছে প্রয়াগ তীর্থ পরিত্যাগ করিয়া সুরধুনী শিব-দুর্গার প্রিয় কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন; বঙ্গভাষাও সেইরূ কবিকঙ্কণের চণ্ডীর ছটা মস্তকে ধারণ করিয়া আহ্লাদে উৎফুল্লা হইলেন; অনন্তর জহ্নু তনয়া যেমন

অযোধ্যা ধৌতকারিণী নির্ম্মল সলিলা সরযুকে প্রাপ্ত হইয়া সুখী হইলেন, বঙ্গভাষাও তদ্রূপ কৃত্তিবাস প্রদত্ত রামায়ণ কণ্ঠে ধারণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন; তদনন্তর গঙ্গা মগধ সমীপে সমাগত হইয়া জরাসন্ধের বৃত্তান্ত দ্বারা কৃষ্ণার্জ্জুনের পরিচয় পাইলেন ও তথায় ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন, সেইরূপ বাঙ্গালা সাহিত্যও কাশীরাম দাস কর্ত্তৃক, কৃষ্ণার্জ্জুনের অদ্ভুতলীলা বর্ণন ও ঘনরাম, রূপ-রামের ধর্ম্ম ইতিহাস বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া সুখী হইলেন; ক্রমে সুরধুনী নবদ্বীপে আসিয়া উপনীত হইলেন; তথায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্ত্তিকলাপ সন্দর্শন করিলেন; বঙ্গীয় সাহি-ত্যও তদ্রূপ তাঁহার প্রিয় সভাসদ ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ প্রদত্ত মুক্তার মোহন মালা ও কৃষ্ণরাম, প্রাণরামের অলঙ্কার নিচয় কণ্ঠে ধারণ করিয়া প্রীত হইলেন; তদনন্তর গঙ্গা যেমন নবদ্বীপ হইতে বহির্গত হইয়া দক্ষিণে ও বামে নানা গণ্ডগ্রাম, বন-উপবন, নগর-উপনগর রাখিয়া ইংরাজ রাজের কীর্ত্তিপূর্ণ মহানগরী কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, বাঙ্গালা সাহিত্যও তদ্রূপ নিধিরাম গুপ্ত, হরু ঠাকুর, রাসু, দুর্গাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নিকট হইতে আসিয়া আধু-নিক ইংরাজী ভাবাশ্রিত মধুসূদন, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, নবীন-চন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন প্রভৃতির কণ্ঠে লীলা করিতেছেন; কলিকাতা হইতেই গঙ্গা বিস্তৃতি লাভ করিয়া ক্রমশঃ সমুদ্রে যাইয়া মিশিয়াছে—তথায় অনন্ত—অসীম আকার ধারণ করিয়াছে, জানি না কতদিনে বঙ্গভাষা এই অনন্ত মূর্ত্তি ধারণ করিবে; কতদিনে ইহা এমন পরিপুষ্ট হইবে, ইহার কিছুরই অভাব থাকিবে না। তবে একটা কথা বলা

ভাষার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় নহে; যে বঙ্গবাসী ত্রিংশৎ বৎসর মধ্যেই বঙ্গভাষার এরূপ যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন, শত বৎসর পরে যে, সে ভাষা উন্নতির উচ্চতোরণে অবস্থাপিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? এক্ষণে বঙ্গবাসী বুঝিয়াছেন যে, জাতীয় সাহিত্যের নিকট আর কিছুই তিষ্টিতে পারে না; পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রথমে যে ভাষায় কথা কহিতে শিখিয়াছি– বাল্যকালের নিষ্পাপ সময়ে যে ভাষায় বাল-সুহৃদগণের সহিত মিষ্টালাপ করিয়াছি—যৌবনে প্রণয়িনীর সহিত যে ভাষায় প্রেমালাপ করিয়া থাকি, সে ভাষা যে অতি আদরের ধন তাহা বঙ্গবাসী এক্ষণে বুঝিয়াছেন। যখন দেখিতে পাওয়া যায় বাঙ্গালী বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়াও বাঙ্গালাভাষাকে মাতৃভাষা বলিতেছেন—তাহার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন; তখন আমাদের আশঙ্কা করিবার আর কারণ কি? যে বাঙ্গালী কিছু দিন পূর্ব্বে বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া স্বদেশবাসীগণকে "নেটিভ নিগার" বলিয়া সম্বোধন করিতেন—বাঙ্গালা কথা মুখেও আনিতেন না—আবার সময়ে সময়ে বলিতেন বঙ্গদেশ আমার জন্ম স্থান হইলেও দুঃখের বিষয় আমি বাঙ্গালা ভুলিয়া গিয়াছি" (পাঠক হাসিবেন না—এটি সত্য কথা) সেই বাঙ্গালিই যখন স্বর্গধাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেই বাঙ্গালাভাষারই আলোচনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন আর আশঙ্কার কারণ কি? এক্ষণে যখন ইংরাজী বক্তাগণ ইংরাজী ছাড়িয়া দুই এক স্থলে বাঙ্গালাতেও বক্তৃতা করিতেছেন—যখন অনেক কৃতবিদ্য লোক ইংরাজী ছাড়িয়া বাঙ্গালাতে পত্রাদি লিখিতে ধরিয়াছেন, তখন আর আমাদের আশঙ্কা

করিবার কারণ কি আছে? তবেই একক্ষণে দেখা য
বাঙ্গালার প্রতি বাঙ্গালীর আদর বাড়িয়াছে;—বাঙ্গাল
বুঝিয়াছেন জাতীয় পতাকার নিম্নেই জাতীয় সাহিত্য
তিনি বঙ্গভাষার আদর করিতেছেন। জনৈক ইংরাজ
লিখিয়াছেন "জাতীয় পতাকার নিম্নেই জাতীয় সাহিত
পাইবার সামগ্রী; এই জন্য প্রত্যেক যুবকের অন্ততঃ
নের তৃতীয়াংশ সময় ইহার উন্নতি কল্পে ক্ষেপণ করা ক
আমাদের জাতীয় পতাকা নাই—সুতরাং জাতীয় সা
আমাদের প্রধান পূজার দ্রব্য; বাঙ্গালী এই কথাটি বু
ছেন ইহা সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। বিশেষতঃ এ
এই ত্রিংশৎ বৎসরের মধ্যেই ভাষার যাদৃশ শ্রী-সম্পাদন ক
ছেন, অন্য কোন জাতি—এত অল্প সময়ের
এতাদৃশ উন্নতি সংসাধন করিতে সমর্থ হন নাই। বা
চিরকাল জরাগ্রস্ত—তাঁহার গৌরব করিবার কিছুই ন
কেবল তাঁহার ভাষার উন্নতিই তাঁহার গৌরব করিবার
বাঙ্গালী এই ভাষার দোহাই দিয়াই জগতের সমক্ষে দণ্ডায়
হইতে পারেন।

জাতীয় সাহিত্যই জাতীয় উন্নতির মূল; জাতীয় সা
যেমন জাতীয় জীবনের উন্মেষক, এমন আর কিছুই ন
জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি হইতে আরম্ভ হইলেই স্বা
চিন্তাও তৎসহ সমাজে প্রবেশ পথ পায় এবং সেই স্বা
চিন্তা স্রোত হইতেই ক্রমশঃ সমাজে জাতীয় চরিত্র স্বা
ভাবে গঠিত হইতে থাকে। সুতরাং ভাষা সমাজের সাধা
উপকারী নহে; বঙ্গবাসী সেই ভাষার আদর করিতে শি
য়াছেন—এই ত্রিংশৎ বৎসর মধ্যেই তাহার এতাদৃশ উন্ন

সাধন করিতে পারিয়াছেন—ইহা তাঁহার পক্ষে সামান্য গৌরবের কথা নহে। কিন্তু এক্ষণেও অনেক বাকী আছে—ভাষার এই উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছে, অতএব বঙ্গবাসী! এই সময় হইতে ইহার উন্নতি কল্পে অধিকতর মনোযোগী হও—দেখিবে, শত বৎসর পরে তোমরা পৃথিবীর মধ্যে এক গণনীয় জাতি মধ্যে পরিগণিত হইবে—তখন আর এক্ষণকার মত নগণ্য মধ্যে পড়িয়া থাকিবে না। তবে একবার সমবেত হইয়া—নবীন উৎসাহে মাতিয়া—ইহার শ্রীবৃদ্ধি সংসাধন করিতে ব্রতী হও; যৎকালে চতুর্দ্দিকেই আশালোক জ্বলিতেছে, তখন আর আশঙ্কা করিবার কারণ কি? যখন জাতীয় সাহিত্যই জাতীয় উন্নতির মূল, তখন সেই সাহিত্যের ঔৎকর্ষ সাধন করিতে সমধিক যত্নবান হও—তাহার সুফল শীঘ্রই ফলবতী হইবে।

ইতি প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।